আশুতোষ কলেজে ◎ পত্রিকা ◎

একত্রিংশ খণ্ড * ১৩৬৩

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

মানব ইতিহাসের পঁচিশ শ'বৎসর পূর্বের এক বিচিত্র কাহিনী। খৃষ্টপূর্ব ৫৪৪ সনের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। হিরণ্যবতী নদীর পরপারে কুশীনগরের বহিঃপ্রান্তে অবস্থিত শালবনে অকালে উদ্গত শালের মঞ্জরী ও নবকিশলয় রাজি জ্যোৎস্নাসিক্ত হয়ে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে। জীবনের কর্ম সমাপন করে বিরাট পুরুষ ভগবান্ তথাগত প্রিয় শিষ্য আনন্দকে নিয়ে এখানে উপস্থিত হ'লেন। পাকাশয়ের তীব্র বেদনায় তাঁর শরীর একান্ত ক্লিষ্ট ও অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু তাঁর প্রশান্ত, গম্ভীর, সৌম্য মুখচ্ছবিতে যন্ত্রণার কোন চিহ্ন নেই। তাঁর নির্দেশে শালতরুতলে শয্যা রচিত হ'ল। সেই অন্তিম শয্যায় তিনি দক্ষিণপার্শ্বে সিংহশয়নে শায়িত হ'লেন। শেষবারের মত আনন্দ ও অন্যান্য ভিক্ষুদের সান্ত্বনা ও উপদেশ দিয়ে রাত্রির তৃতীয় যামে তিনি নির্বাণ লাভ করলেন। ইহাই তাঁর মহাপরিনির্বাণ। তাঁরই জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কোটি কোটি নরনারী তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে ভক্তিনম্র শিরে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছে।

যাঁদের চরণস্পর্শে ভারতের ধূলিকণা তীর্থরেণুতে পরিণত হয়েছে সেই লোকোত্তর পুরুষদের পুরোভাগে রয়েছেন ভগবান্ বুদ্ধ। বেদ ও উপনিষদের যুগের অবসানে ভারতের আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে একটা গুরুতর সঙ্কট উপস্থিত হ'ল। স্বাধীন ও বলিষ্ঠ আধ্যাত্মিক চিন্তার ধারা ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড-মূলক ধর্মের প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠানের মরুপ্রান্তরে আপনাকে হারিয়ে ফেলল। যজ্ঞে বলি প্রদত্ত অসহায় পশুর কাতর আর্তিতে ভারতের শাশ্বত আত্মা বিচলিত হ'লেন। ইতিহাসের এই সঙ্কট মুহূর্তে এক দুর্জ্ঞেয় আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে ভারতের

সৃষ্টি ও সাধনার সহস্রদল পদ্ম হ'তে আবির্ভূত হ'লেন করুণা ও মৈত্রীর অবতার ভগবান্ তথাগত। তাঁর জন্ম, তাঁর মহানিষ্ক্রমণ, তাঁর কঠোর তপশ্চর্যা ও বোধিলাভ, তাঁর ধর্মচক্র-প্রবর্তন, তাঁর সঙ্ঘ গঠন, তাঁর মহাপরিনির্বাণ— এ যেন একটা বিরাট মহাকাব্যের এক একটি অবিস্মরণীয় সর্গ।

২৫৮০ বৎসর পূর্বের প্রাচীন ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাই ভারতের উত্তর প্রান্তে হিমালয়ের পাদদেশে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। রাজধানী কপিলবাস্তু নগরীর উপকণ্ঠে ছিল লুম্বিনী নামে একটি রমণীয় উপবন। শালতরুসমূহের নবপল্লব ও মঞ্জরীতে শোভিত এই বনস্থলীতে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ ভূমিষ্ঠ হ'লেন। রাজপুরীর ভোগ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হ'য়েও তাঁর মন সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিল। দুঃখ, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর তাড়নায় নিপীড়িত মানবের মুক্তি পথের সন্ধানে তিনি সর্বদা ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তারপর এক দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে একদিন তিনি গৃহ হ'তে মহানিষ্ক্রমণ করলেন। স্ত্রী ও সদ্যোজাত পুত্রের মায়া তাকে গৃহে টেনে রাখতে পারলনা। রাজপুত্র মানবের মুক্তির জন্য জীর্ণ চীর প'রে পথের ভিখারী হলেন। দীর্ঘ ছয় বৎসর ব্যাপী কঠোর তপশ্চর্যায় তার শরীর অস্থিচর্মসার হ'ল; তিনি মৃত্যুর সম্মুখীন হলেন। তিনি বৃথা কৃচ্ছ্রসাধনের অসারতা বুঝলেন এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন।

একদিন নৈরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবিল্ব গ্রামে এক অশ্বত্থ বৃক্ষ তলে তিনি ধ্যানে বসলেন। সেদিনও ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। আকাশ ভুবন জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। দূরে নৈরঞ্জনা নদীর গলিত স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জলধারা ধীরে বয়ে যাচ্ছে। বিশ্বচরাচরে একটা গম্ভীর শান্তি বিরাজ করছে। মারের সহস্র প্রলোভন ও উপদ্রবেও শাক্যমুনির হৃদয় শান্ত, অচঞ্চল, সমাহিত। রাত্রি শেষে অধ্যাত্ম জ্ঞানের অপূর্ব আলোকে তাঁর চিত্ত উদ্ভাসিত হ'ল; তিনি দুর্লভ মহাসম্বোধি লাভ করলেন। দুঃখ, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর যন্ত্রণায় পীড়িত মানবের জন্য তিনি মুক্তি পথের সন্ধান পেলেন।

দৃশ্যপটের পরিবর্তন হ'ল। এই নবলব্ধ জ্ঞান অকাতরে মানুষকে বিতরণ করবেন, এই মহান সঙ্কল্প নিয়ে তিনি এলেন বারাণসীর নিকটে ঋষিপত্তনে। তাঁর পূর্বসাথী পঞ্চভিক্ষু তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। মৃগদাবের সেই শান্ত আশ্রমপদে সন্ধ্যার অন্ধকার তখন নেমে এসেছে। এই প্রশান্ত গম্ভীর পরিবেশে তিনি সেই পঞ্চভিক্ষুকে সম্বোধন ক'রে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমার কথায় কান দাও, আমি

অমৃত লাভ করেছি; আমি উপদেশ দিব; আমি তোমাদের ধর্ম শিক্ষা দিব; আমার প্রদর্শিত পথে চললে তোমরাও সেই ধর্ম বুঝতে পারবে। ভগবান্ তথাগত তাদের শরীর নিগ্রহের পথ পরিত্যাগ করে আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণের উপদেশ দিলেন। এই পথই দুঃখ নিবৃত্তির পথ, নির্বাণ লাভের পথ। তাঁর মতে তৃষ্ণার আত্যন্তিক নিরোধ এবং তার উচ্ছেদ হ'লেই দুঃখের নিরোধ হয়। এই ব্যাখ্যান দ্বারাই ভগবান্ তথাগত ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। সারনাথের যে স্থানে বসে ভগবান্ বুদ্ধ সর্বপ্রথম তাঁর পঞ্চশিষ্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন সেই স্থানে ধর্মরাজিকা চৈত্য নামে বিরাট স্তূপ আজিও নীরব ভাষায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে উচ্চারিত সেই অমৃত বাণী প্রচার করছে।

তারপর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরে তিনি মগধ, বৈশালী, কোশল, কৌশাম্বী প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে মানবের মুক্তির বাণী প্রচার করেছেন। তার পুণ্য পাদস্পর্শে লুম্বিনী, গয়াশীর্ষ, উরুবিল্ব, নালন্দা, রাজগৃহ, বেণুবন, গৃধ্রকূট, বৈশালী ও মহাবন, শ্রাবস্তী ও জেতবন, কৌশাম্বী ও শিংশপাবন এবং কুশীনগর মহাতীর্থে পরিণত হ'ল। ভগবান্ বুদ্ধের বিরাট ব্যক্তিত্ব, তাঁর চরিত্রের অতুলনীয় স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য, তাঁর সঙ্কল্পের বজ্রকঠোর দৃঢ়তা, তাঁর সত্য ও প্রিয়বাক্যে আকৃষ্ট হ'য়ে সহস্র সহস্র ভক্ত তাঁর পদপ্রান্তে আশ্রয় নিল। এই শিষ্যদের অগ্রণী ছিলেন সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন, আনন্দ, অনাথপিণ্ডদ, মহাপ্রজাবতী ও বিশাখা। এঁদের সাহায্যেই ভগবান্ বুদ্ধ গড়ে তুললেন দেশব্যাপী তাঁর বিশাল সঙ্ঘ। যে শক্তির প্রভাবে ভগবান্ বুদ্ধের ধর্ম ও নীতিদর্শন কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই সমগ্র পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে—তার মূল উৎস ছিল ভগবান্ তথাগতের ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক প্রতিভা।

ক্রমে ভগবান্ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সময় ঘনিয়ে এল। ইতিপূর্ব্বেই তাঁর প্রধান শিষ্যদ্বয় সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন দেহ রক্ষা করেছেন। কিন্তু তিনি ধীর স্থির, শান্ত সৌম্য; শোকের কোন লক্ষণ তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেলনা। সারিপুত্রের মৃত্যু উপলক্ষে তিনি শিষ্যদের পার্থিব বস্তুর নশ্বরতা সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। বৈশালী নগরের অনতিদূরে তিনি শেষ বর্ষা যাপন করেন। পাবাগ্রামের চুন্দ নামে এক কর্মকার তাঁকে ভিক্ষায় নিমন্ত্রণ করে। আহার্য দ্রব্যের মধ্যে সূকরমদ্দব নামে একটি বস্তু ভক্ষণ করে তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হন। এই অবস্থায় হিরণ্যবতী নদীর পরপারে কুশীনগরের নিকটস্থ এক শালবনে তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হ'লে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী ও রাজন্যবর্গ পরম ভক্তিভরে তাঁর চিতাভস্ম সংগ্রহ করে তার উপরে চৈত্য, বিহার বা স্মৃতি-মন্দির নির্মাণ করেন। এইরূপে মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরুর তিরোধান হ'ল।

মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পূর্বে একদিন আনন্দকে নিয়ে কোন পর্বতের পাদ-দেশে একটি সুরম্য অরণ্যের নৈসর্গিক শোভা দেখে তাঁর চিত্ত অতিশয় প্রসন্ন হয়। তিনি আনন্দকে বলেন, আশ্চর্য দেশ এই জম্বুদ্বীপ (ভারতবর্ষ); এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা বিচিত্র। এই সুন্দর দেশের কোটি কোটি মানবের জন্য তিনি মুক্তির পথ আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মৃত্যুর বহুশতাব্দী পরে তাঁর প্রচারিত ধর্ম ও নীতি-দর্শন, তাঁর অহিংসা, মৈত্রী ও করুণার বাণী আপাতদৃষ্টিতে ভারতবর্ষ হ'তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও তা ভারতবাসীর অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করে ভারতের ধর্ম ও কৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেছে। আজ ভগবান্ বুদ্ধ হিন্দুর অবতাররূপে পূজিত। বুদ্ধের মৃত্যুর কয়েক শ বৎসরের মধ্যেই ভারতের নগর জনপদ চৈত্য, বিহার ও সঙ্ঘারামে ভরে উঠেছে। রাজর্ষি অশোক বৌদ্ধধর্মের মর্মকথা ভারতের সর্বত্র পর্বত ও স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ করে দিয়েছেন। তাঁরই নির্দেশে এই মহাবাণী প্রচার করবার জন্য তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা বোধিদ্রুমের শাখা বহন করে সিংহলে গিয়েছেন। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, তাতার, চীন, জাপান, শ্যাম, কাম্বোজ, সুমাত্রা, ও যবদ্বীপে এই বাণী প্রচার করেছেন। এই সকল দেশের পর্বত অরণ্য, আকাশ বাতাস ত্রিশরণ মন্ত্রের উদাত্তগম্ভীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছে। ভারতের শিল্পীদের রচিত ধ্যানীবুদ্ধের অসংখ্য মূর্তি ভারতের ভাস্কর্য ও শিল্পপ্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন। অজন্তা ও ইলোরার গুহাগাত্রে বুদ্ধের জীবনী ও জাতকের কাহিনী অবলম্বন করে ভারতীয় শিল্পিগণ যে অপূর্ব চিত্রাবলী অঙ্কিত করেছেন, তা আজিও জগতের বিস্ময়ের বস্তু হয়ে রয়েছে। শান্তির পথে বিজয় অভিযান পরিচালনা ক'রে ভারতীয় ধর্ম কৃষ্টি ও সভ্যতা দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় এক বিশাল ধর্মরাজ্য গড়ে তুলেছিল। বরবোদুরের মন্দির বৌদ্ধযুগের ভারতীয় প্রতিভার এক বিরাট কীর্তি। এই মন্দিরের কঠিন প্রস্তরের ছন্দে ছন্দে অজ্ঞাতনামা ভারতীয় শিল্পীর দল চিরকালের জন্য ভগবান্ তথাগতের প্রতি তাঁদের অক্ষয় প্রণাম জানিয়ে গিয়েছেন।

পৃথিবী আজ হিংসায় উন্মত্ত; স্বার্থের সংঘাতে দিশাহারা হ'য়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পর হানাহানির উদ্যোগ করছে; মারণাস্ত্র আবিষ্কারে তারা পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। বিশ্বব্যাপী এই বিকট কোলাহল, শক্তি ও দম্ভের

এই তাণ্ডবলীলার মধ্যে—ভারতবর্ষ বিশ্ববাসীকে যে অহিংসা, মৈত্রী ও শান্তির চিরন্তনী বাণী শোনাচ্ছে তা সেই শাক্যমুনির প্রচারিত ধর্ম ও জীবনদর্শনেরই সারমর্ম। ভগবান্ তথাগত হ'তে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে যে আধ্যাত্মিক রহস্যের ঐতিহ্য চলে এসেছে মহাত্মা গান্ধীর প্রচারিত শান্তি ও অহিংসার বাণীর মধ্যে, এবং স্বাধীন ভারতবর্ষ পররাষ্ট্র সম্পর্কে যে সক্রিয় নিরপেক্ষতা ও পঞ্চশীলের উদার নীতির অনুসরণ করছে তার মধ্যে ভারতের সেই চিরন্তন ভাবধারাই অভিব্যক্তি লাভ করেছে। ভগবান্ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সার্ধদ্বিসহস্র বার্ষিক জয়ন্তী উৎসব তাই আজ বিশ্বমানবের নিকট গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। অনিবার্য ধ্বংস ও মহামৃত্যুর হাত হ'তে বাঁচতে হ'লে পঁচিশ শ' বৎসর পূর্বে ভগবান্ তথাগত যে পথনির্দেশ করে গেছেন সেই পথই অনুসরণ করতে হবে—নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়। এই পুণ্যদিনে সেই বিরাট পুরুষকে স্মরণ ক'রে আমরা তাঁর চরণে বারংবার প্রণিপাত করি। তাঁর পদরজ মস্তকে ধারণ করে বলি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি।

…আসিয়াছে দিন,
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির—
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।

—রবীন্দ্রনাথ

গল্প

অভিনয়

বিজনকুমার ঘোষ

তৃতীয় বর্ষ। সাহিত্য

কাকীমার সঙ্গে আমার একদিন পরিচয় হয়েছিল এবং তা নিবিড় হতে না হতেই একটা নিষ্ঠুর আঘাতে ছিঁড়ে গিয়েছিল—এ কথা যখনি ভাবি তখনি মনের ভিতর এক অস্বাভাবিক জ্বালা অনুভব করতে থাকি। কতদিন চলে গেল তারপর, কিছুতেই শেষ করে দিতে পারি না সেই পুরোনো কথাটাকে। মনের হৃৎপিণ্ডে তা যেন দুরন্ত যক্ষার জীবাণুর মত বাসা বেধে আছে।

কাকীমার সঙ্গে পরিচয় হওয়াটাই ছিল এক অস্বাভাবিক ব্যাপার। কোন কালে যে সম্ভব—তাও আগে ধারণা পর্য্যন্ত করতে পারি নি। কারণ, কাকীমা থাকতেন সুদূর মালয়ের রাজধানী কুয়ালালামপুরে, আর আমি মধ্য বাংলার এক গণ্ডগ্রাম, ধোবড়াকোলে। তবুও আমাদের পরিচয় হয়েছিল। স্থান ছিল বরিশাল শহর।

এর পেছনে একটু ইতিহাস আছে বৈ কি। কয়েকটা ঘটনা পর পর ঘটে গেল। যার ফলে আমাদের পরিচয় নিঃশ্বাসের মত সহজ হয়ে উঠতে পেরেছিল।

ঠাকুরমা তখন জীবিত ছিলেন। অমল কাকা জেলে মারা যাবার পর তিনি যেন একটু অন্য রকম হয়ে গিয়েছিলেন। সংসার থেকে সব চিহ্ন মুছে পূজোর ঘরেই কাটাতেন দিনের বারো আনা সময়। বাবারা ছিলেন তিন ভাই। বাবা থাকতেন ধোবড়াকোলে। বড় কাকা রেঙ্গুনে, আর ছোট কাকা কুয়ালালামপুরে। ঠাকুরমা কিন্তু কোন ছেলের কাছেই থাকতে চাইতেন না। শ্বশুরের ভিটেতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন, এই তাঁর ইচ্ছে ছিল। তাই সেবা যত্ন করবার জন্য কাকীমাকে মালয় থেকে বরিশালে আসতে হয়েছিল। আর আমাকে যেতে হয়েছিল অন্য কারণে। গ্রামের ইস্কুল থেকে পাশ করবার পর ঠিক হ'ল আমি কলকাতায় থেকে পড়ব। কিন্তু মার একান্ত অমত। পাড়াগাঁর ছেলে। কোন কালে শহরে থাকি নাই। তার ওপর কলকাতার মত শহর, গাড়ি ঘোড়ায় নির্ঘাত মারা পড়ব—এই সাব্যস্ত হল। তাছাড়া কাকীমা বরিশালে একেবারে নতুন। কাছে কেউ থাকলে সুবিধে হয়। সুতরাং আমাকেই পাঠানো হল।

এটা স্বাভাবিক যে, এ সংবাদে আমার খুবই আনন্দ হয়েছিল। মালয়ের কাকীমার কথা ছোট বেলা থেকেই শুনে এসেছি আর মনে মনে কত কথা ভেবেছি। কতদূর সে দেশ, কোন দিক দিয়ে যেতে হয়? জাহাজে করে রেঙ্গুন যেতে লাগে তিন দিন, আর রেঙ্গুন থেকে কুয়ালালামপুরে যেতে লাগে ছয় দিন। প্লেনে অবশ্য একদিনেই যাওয়া যায়। কিন্তু তাহলে নাকি আমাদের ভিটেমাটি বেচতে হয়। সে দেশের মাটির রং কেমন জানি না। মালয়ের আকাশে কি আমাদের দেশের মতই মেঘ ভাসতে থাকে? সেখানে কি নদীর ধারে ধান ক্ষেত আছে?—একদিন যাব। বড় হয়ে দেখতে যাব। কিন্তু মনে ঘোর সন্দেহ। আমি কি বড় হব কোন কালে, বাবার মত? যাই হোক, বাবার মত বড় না হয়েও যদি চোখে না দেখা যাক কানে শোনা যায় খোদ কাকীমার কাছ থেকেই তো মন্দ কি?

প্রথমে একটু হতাশ হলাম। মনে মনে কাকীমার যে আকৃতি এঁকেছিলাম আসলে তার সঙ্গে একটুও মিল নেই। পরিচিত প্রতিবেশীদের ভিতর কাকীমাদের যে রূপ আমারো সেই রূপ। কিন্তু কাকীমার রূপ তার উলটো। একটাও দাঁত পড়েনি, চুল পাকে নি। আপেলের মত লাল টকটকে রং। আর কি সুন্দর চেহারা! হাসলে আরো সুন্দর দেখায়। কথা বলতেন আস্তে আস্তে। চোখে সব সময় একটা উদার উদাস দৃষ্টি। গাম্ভীর্য্যের এমন মোহন রূপ আমি এর আগে দেখি নি। কাকীমার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে কখনো জিজ্ঞাসা করতাম, কাকীমা মালয়ের গল্প বল?

—কি গল্প?

—যে কোন গল্প।

—মিলিটারীদের গল্প শুনবে?

—হুঁ।

কাকীমা আরম্ভ করতেন, জানো তো, সব দেশের মিলিটারীই খুব ডিসিপ্লিন মেনে চলে। কিন্তু ও দেশের মিলিটারী আবার এক ডিগ্রী ওপরে। আমাদের কোয়ার্টারের পাশেই একটা মিলিটারী ব্যারাক ছিল। রোজ বিকেলে গা ধুয়ে ছাদে উঠে দেখতাম ওদের প্যারেড। একদিন একজন সৈন্য বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত হল। বিচারে শাস্তি হল—মৃত্যু। ক্যাপ্টেন খাপ থেকে তরোয়াল খুললেন। ওরা অকারণে গুলি খরচ করে না। এমন সময় অন্য একজন সৈন্য এসে প্রমাণ করে দিল, সে নির্দ্দোষ। ওদের নিয়ম হচ্ছে খাপ থেকে তরোয়াল

খুললেই কিছু রক্তপাত করতেই হবে। ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে তার বাঁ হাতের ছুটো আঙুল কেটে ফেললেন।

আমি স্তম্ভিত। কাকীমা বলে চললেন, ওদের দেশে থাকতে থাকতে তোমার কাকার মেজাজও অনেকটা ওই রকম হয়ে গেছে। কিছুতেই বিশৃঙ্খলা সহ্য করতে পারেন না। তার আদরের ভাগনে কালুকে তিনি কত ভালবাসেন। সেই কালুর একবার দামী কোটটাকে তিনি রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

—কেন?

—চেয়ারের হাতলে রেখে দিয়েছিল বলে। আশ্চর্য্য হয়ে যাই যখন তার কথা ভাবি। এদেশে যখন আমাকে পৌছে দিতে এসেছিলেন তখন তার আরেক রূপ দেখলাম। কি সহজ মানুষ! বড় বাড়ীতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাবা খেলেছেন বুড়ো ভূপেন গুহের সাথে। তাস খেলেছেন কত রাত পর্য্যন্ত। নাইতে গেছেন কখন আর ফিরছেন না। গিয়ে দেখি পাড়ার ছেলেদের সাথে গুলি খেলছেন পুকুর ঘাটে। এই কুড়ি দিনের ছুটিটা যেন ঝড়ের মত, মাতালের মত কাটিয়ে দিয়ে গেলেন এখানে। আবার ওখানে গিয়ে আরেক মানুষ হয়ে যাবেন। তার মুখের দিকে চেয়ে কেউ কথা বলতে সাহস করে না। ঘরে যখন থাকেন তখন সারা বাড়ী থম থম করে। অথচ এ হ'ল তার বাইরের রূপ। আসলে তিনি অত্যন্ত নরম। আমাকে না জানিয়ে কত টাকা যে গরীব দুঃখীদের দান করেন—

—কাকীমা, কাকা কবে আসবেন?—কথার মাঝে আমি জিজ্ঞাসা করতাম।

—তা কি করে বলব? ওখানে হাই পোষ্ট হোল্ড করেন, ছুটিছাটা মোটেই পান না। এই তো পাঁচ বছর পর কুড়ি দিনের ছুটি নিয়ে এসেছিলেন। আর এত টাকা পয়সা খরচ করে যদি দু'দিনের বেশী না থাকতে পারেন তো সে আসার কোন মানে হয়?

অবুঝের মত বলতাম, তাহলে কাকীমা, তুমি কবে মালয় যাবে?

এবারে একটা চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাস আস্তে আস্তে পড়ত—লক্ষ্য করতাম।

—ঠাকুরমা যতদিন বেঁচে থাকেন ততদিন এখানেই থাকতে হবে।

—তবে ঠাকুরমা—সহসা ভুল বুঝতে পেরে চুপ করে যেতাম।

—ছিঃ বাদল, ওরকম বলতে নেই। জানো, ঠাকুরমা মারা গেলে উনি কত কষ্ট পাবেন? এবার নাইতে যাও, তোমার ইস্কুলের বেলা হয়ে গেছে।

ধোবড়াকোল ছেড়ে এখানে এসেছি প্রায় সাত মাস হল। এর আগে কখনো

এক সঙ্গে এতদিন মাকে ছেড়ে থাকিনি। প্রথম প্রথম একটু কষ্টই হয়েছিল। ঘুমের ঘোরে মাকে খুঁজতাম। কিন্তু কাকীমা সব কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যেন মায়ের আধুনিক সংস্করণ। দুদিনের ভিতরেই শূন্যের অসহায় বলের মত আমাকে লুফে নিলেন। আমার মনের সব কথা কাকীমার কাছে। কাকীমাও আমাকে ছাড়া চলতে পারেন না। দুটি অসমবয়স্ক বন্ধু। কাকীমা অনর্গল বলে চলতেন আর আমি নির্বাক মুগ্ধ শ্রোতা।

একটা জিনিষ লক্ষ্য করতাম যে কাকীমা পাড়ার কারো সঙ্গে বড় বিশেষ মিশতেন না। আপন মনেই চলতেন। অবশ্য বাড়ীতে কেউ এলে আদর যত্নের ত্রুটী করতেন না। চায়ের জল চাপিয়ে খাবার বানাতে বসতেন। এদিকে এই প্রথাটির বড়ই অভাব। সুতরাং বাড়ীতে নিত্য অতিথির অভাব হ'ত না। আরম্ভ হ'ত তখন চারিদিক থেকে কুশল গুঞ্জন: বৌমা আমাকে পাঁচটা টাকা দিও। তোমার নামে কুন্দিহারে মায়ের কাছে মানত করব।

ওদিক থেকে আরেক জন: সাক্ষাৎ জাগ্রত মা। গেল বারে সতীশের বৌ-র নামে করেছিলাম—বছর ঘুরতেই চাঁদ বদন ছেলে।

—আমি কি জানি? মাকে বলবেন।—

কেউ চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞাসা করত, বৌমা আজ কি দিয়ে ভাত খেলে?

বিরক্ত হলেও হাসি মুখে সব সহ্য করতেন কাকীমা; সব কথার উত্তর দিতেন।

এর আগেই আমি শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ পড়ে ফেলেছিলাম; স্থান অবশ্য খাটের তলায়। রমেশের জ্যাঠাইমার সেই আশ্চর্য্য কথাটা মনে পড়ে যেত। বলতাম, কাকীমা, ভগবান যখন তোমাকে এদের মাঝখানেই পাঠিয়েছেন—

কথা শেষ করতে না দিয়েই হেসে উঠেছিলেন।

—ভগবানের ইচ্ছেই ইচ্ছে, আর আমার কোন ইচ্ছে নেই?

কথাগুলির মানে ঠিক ঠিক না বুঝলেও এটুকু বুঝতাম যে এটি একটি অকাট্য যুক্তি। উত্তর খুঁজে পেতাম না।

একবার আমরা নৌকো করে বরিশাল থেকে বানরীপাড়ায় গিয়েছিলাম। বানরীপাড়ায় আমার এক পিসিমা থাকেন। অনেকবার যেতে লিখেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে যাওয়া হয়ে উঠত না। তাছাড়া ঠাকুরমা বেশী নড়তে চড়তে পারেন না, চোখেও ভাল দেখতে পান না—তাকে ফেলে কি করে যাওয়া যায়? কিন্তু সেবার

তিনিই আমাদের জোর করে পাঠিয়েছিলেন—একদিনের জন্যে। সকালে যাব আর বিকেলে ফিরব।

কিন্তু বিকেলে ফিরতে পারিনি। বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল আমার এক পিসতুতো ভাই। অসহ্য গরম সে রাতে। ঘুম আসছিল না কিছুতেই, ছটফট করছিলাম।

—ছাদে যাবে, বাদল ?

শরীর যেন জুড়িয়ে যায় এ ডাকে। কাকীমা কি মনের কথা জানেন ? তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছিলাম ছৈএর ওপর। আমাদের নৌকো এই সময় বাঁক ঘুরে বড় খালের মুখে এসে পড়েছিল। আর এক জগতের দুয়ার যেন খুলে গিয়েছিল। জ্যোৎস্নায় চারিদিক ছেয়ে গেছে। সাদা সাদা মেঘের ভেলার পাশ দিয়ে ঝিকিমিকি তারা দেখা যায়। দূর-দিকচক্রবালের সবুজ বন-রেখা নদীর বুকে ক্রমশঃ অপসৃয়মান। এক চাঁদ হাজার চাঁদ হয়ে যেন ঝরে পড়েছিল অচেনা খালের তরঙ্গমালায়। এই স্বপ্ন-বিহ্বল পরিবেশে মন যেন পাখ্না মেলে উড়ে যেতে চায় রূপকথার দেশে।

মুখে আমার ঈষৎ গর্ব্বের আভাস। বলেছিলাম, কাকীমা, তোমাদের মালয় এত সুন্দর ?

—হুঁ।—অম্লান মুখ কাকীমার।

কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না।

—ঘরের কোনে বন্ধ হয়ে আছ কি না তাই ওই রকম মনে হয়। মালয় দেশটা যে কত সুন্দর চোখে না দেখলে আমিও হয়ত তাই মনে করতাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কাকীমার উদাস দৃষ্টি ঢেউ খেলানো সবুজ ধান ক্ষেতের বুকে।

—হ্যাঁ, বাংলা দেশেরও একটা শোভা আছে, তা অলস লোকের জন্যেই। কাজের লোক তা দেখতে পায় না। ওদেশে তার উলটো। অলস লোকের পাত্তা নেই মোটেই। মালয়ের সব সৌন্দর্য্য শুধু কাজের লোকের চোখেই ধরা পড়ে। তার কথাই বলি। মালয় গোল্ড মাইনের তিনি চীফ্ কেমিষ্ট্। কত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। সাত সকালে বেরিয়ে যান, আর ফেরেন পাঁচটায়। মাঝখানে শুধু একবার টিফিনে ভাত খেতে আসেন। কাগজখানা দেখবারও সময় পান না। আমি ইম্পরটেন্ট খবরগুলো দাগ দিয়ে রাখি, উনি এসে পড়েন। তারপর বিকেল বেলায় স্নানের পর আমরা মটর নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। শহর ছাড়িয়ে ধানক্ষেত আর কলা বাগানের

ভিতর দিয়ে ডাংগুন হিলের দিকে এগিয়ে যাই। পথের দুধারে পাইন আর দেবদারু বনের এলোমেলো হাতছানি। ডাংগুন হিল থেকে দেখা যায় নীচে সারি সারি রবার বন—পড়ন্ত আলোয় যেন হোলি খেলছে। একটা কালো পাথরের ওপর বসতাম দুজনে। পাশাপাশি।.....

বরিশালে যখন প্রথম আসি তখন বেশ ছোট-ই ছিলাম। এখন অনেকটা বড় হয়েছি। ভর্তি হয়েছিলাম পঞ্চম শ্রেণীতে, আর এখন আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। মাঝে তিন বছরের ফারাক। আমার পক্ষে অনেকই। এর ভেতরে একবারও ধোবড়াকোলে যাইনি। খুবই ইচ্ছে হ'ত। মাও আসতে লিখতেন। কিন্তু কাকীমার জন্যে যেতে পারতাম না। অসহায়ের মত মুখের দিকে তাকিয়ে বলতেন, যাবে বাদল, আমাকে ছেড়ে ?

একথা কয়টির এত গভীর আবেদন যে 'না' শব্দটি উচ্চারণ করতে এক মুহূর্ত্তও দেরী হত না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভুল বুঝতে পারতাম। তখন আর সময় থাকত না। কাকীমা মালয়ের গল্প আরম্ভ করতেন এবং যথারীতি কাকার কথায় শেষ করতেন।

কিন্তু কাকীমার কথায় মন দেবার মত অবস্থা থাকত না। বুকের খুব কাছে একটা ব্যথা অনুভব করতাম। শুধু মা'র জন্যে নয়। ধোবড়াকোলের জন্যেও। মেঘলা দিনেই বিশেষ করে মনে পড়ত। কালো মেঘের সঙ্গে ঝোড়ো ঝোড়ো হাওয়া। ধোবড়াকোলে আমাদের বাড়ীর চারপাশে কত রকমের আমের গাছ! আষাঢ়ে, বৈশাখী, পেয়ারাফুলি, কানাইবাঁশী। দমকা বাতাসে ঝুপঝাপ আমের বৃষ্টি হত। মাষ্টার মশাই তখন আমাদের ছুটি দিতেন। তারপর বৃষ্টিতে ভেজার সে কি উল্লাস। মনে মনেই ফিরে পেতাম সেই হারানো দিনগুলি। এখানেও রেইন গাছের মাথায় কালো মেঘেরা ভিড় করে। নদীর পারে নারকেল সুপারির বন ডাইনে বায়ে দুলতে থাকে। কাকীমা, মালয় তখন বহুদূরে। বই ফেলে পূবের বারান্দায় গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে হত। কোন উপায় ছিল না।

সেবার বাবা নিজেই বরিশালে গিয়েছিলেন—বৈষয়িক কাজে। ফেরবার পথে আমাকে ধোবড়াকোলে নিয়ে যাবেন—এই ইচ্ছে ছিল। সাহস একটু পেয়েছিলাম। বাবার সামনে কাকীমার কথায় মোটেই বিচলিত হইনি।

কিন্তু এই যাওয়াই আমার কাল হয়েছিল। আগে যদি বুঝতাম তো কিছুতেই যেতে চাইতাম না। যাই হোক, যখন ফিরবার কথা তার অনেক পরে ফিরেছিলাম।

ইস্কুল খুলে গিয়েছিল। বোধ হয় এই জন্যেই। কিন্তু প্রথম দিনে মোটেই টের পাইনি। পৌছা মাত্র অন্য কোন কথা নেই মুখে—

—বাদল, একবার বাজারে যাবে? চাকরটা আজ আসেনি।

—কেন?

—একটা জিনিষ করব। ডিম আর চিংড়ি মাছ লাগবে তাতে। মালয়ের এক রকম খাবার নাসিগুরিং। তোমার কাকা খেতে খুব ভালবাসেন।

সত্যি নাসিগুরিং খেতে খুব সুস্বাদু। ভাতটাকে প্রথমে ঘিয়ে ভেজে নিতে হয়। তারপর ওতে ডিমের অমলেট চিংড়ি মাছ ভাজা ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু খুব ঝাল।

—ঝাল না দিলে এর স্বাদ খোলে না। তোমার কাকাও মোটেই ঝাল খেতে পারেন না। কিন্তু নাসিগুরিং এর বেলায় খাওয়া চাই-ই। চোখ মুখ লাল করে গপ্ গপ্ করে গিলতে থাকেন।

কিন্তু নাসিগুরিং এর জোর বেশীক্ষণ রইল না। পরের দিন থেকেই কাকীমাকে আরেক রূপে দেখেছিলাম। বিকেলে মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে আমার জামা খুঁজে পাইনা। এ ঘর সে ঘর—কোথাও নেই। বেমালুম হাওয়া। হয়ত আগের মত সহজ সুরে চিৎকার করে উঠেছিলাম, কাকীমা, আমার জামা কোথায়? হঠাৎ কাকীমা আমার সামনে কালো মেঘের মত স্থির গম্ভীর। একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

—জামা আমি রাস্তায় ফেলে দিয়েছি, আমার মেসিনের ওপর তোমার জামা রাখবার জায়গা? খেয়াল থাকে না কেন?

সত্যিই, গিয়ে দেখি আস্তাকুড়ের ময়লায় জামাটা পড়ে আছে। আশ্চর্য হয়ে যেতাম। আগেও তো এরকম কত হয়েছে। কিন্তু কাকীমা তো কোনদিন রাগ করেন নি।

পরিবর্তনই পৃথিবীর প্রাণ। প্রতিনিয়ত পূর্বাপর সম্বন্ধবিশিষ্ট, এক থেকে আরেক। কিন্তু কাকীমার পরিবর্তন যেন পৃথিবীর হঠাৎ কক্ষপথ ছেড়ে সূর্যের দিকে ধাবিত হওয়ার মত। যুগপৎ ভয় এবং বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলাম। কথা বলেন কম। দরকারী কথা ছাড়া প্রায় বলেন না। সব সময় গম্ভীর। হাটা চলায় একটা মিলিটারী ভাব। তটস্থ হয়ে থাকতাম আমি আর বুড়ো চাকরটা। কখন কি ভুল হয়। কথায় আছে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। ভুল হামেশাই হত, এবং তার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে দিতে ভাবতাম, এ যেন কাকীমা নয়। কাকীমার

দেশের বাঘের গল্প—ক্ষিতীশদা নিজের হাতে কত বাঘ মেরেছে। এ
মালয়ের কাকার গল্প অনেক জোলো।

ব্যাপারটা একদিন চরমে উঠেছিল। সামান্য কারণে কাকীমা ক্ষি
ছাঁটাই করে দিলেন। বেচারার সে রকম কোন দোষ ছিল না। আমা
থাকতে থাকতে চায়ের নেশা হয়ে গিয়েছিল। রোজ রাতে বাড়ী যা
কিছু চা চিনি সঙ্গে নিয়ে যেত। কাকীমা ধরে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই
সেদিন ঘুরে ফিরে শুধু কাকীমার নিষ্ঠুরতার কথাই মনে পড়েছিল। অথ
আগেও দেখেছি ক্ষিতীশদার পরিবারের জন্যে বাক্স খুলে একটা দামী শা
দিতে। পূর্ব্বাপরের এই বিরূপ সম্বন্ধে বোধহয় বিচলিত হয়ে পড়েছিল
ঠাকুরমার কাছেও গিয়েছিলাম একটা বিহিত করবার জন্যে। কিন্তু
কিছু বলবার আগেই ঝড়ের মত ঘরে ঢুকেছিলেন কাকীমা।

—বাঃ বাদল, তোমার তো বেশ উন্নতি হয়েছে। ঠাকুরমার কাছে
নামে লাগাতে এসেছ! আমার মালয় হলে এক্ষুণি ওকে পুলিশে হ্যা
করতাম। চাকর বাকর থাকবে হিলের তলায়—

বলতে বলতে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। একটু দম নিয়ে ফের বললেন, ে
যে কাগজের ইম্‌পর্‌টেণ্ট খবরগুলো দাগ দিতে বলেছিলাম, দিয়েছ?

ভয়ে ভয়ে উত্তর দিয়েছিলাম, না।

—তা দেবে কেন? যাও চাকরের সাথে আরেকটু আড্ডা মার।

তার পরেও অনেকগুলি দিন শুকনো ফুলের পাপড়ির মত ঝরে পড়েছিল
ভাবে। কাকীমারও কোন পরিবর্ত্তন নেই। আরো হয়ত অনেক দিন চ
এমনি ঝিমোনো ভাবে। হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত দিনগুলি যেন ঝিলি
উঠেছিল। কোন দিগন্তের কালো মেঘ মনের আকাশে ছায়া মেলতে
করেছিল, কেউ খোঁজ রাখেনি। তারপর হুড়মুড় করে সেই মেঘ ঝড় আর বৃষ্টি
ক'রে মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়ায় আমরা বিস্ময়ে চমকে উঠেছিলাম।

ইউরোপ তখন টল-টলায়মান। হিটলারের ক্ষমতার দম্ভে সারা ইউ

চোখে ঘুম নেই। আতঙ্কে উদ্বেগে দিশাহারা। এর মাঝে জার্মানীর মারণাস্ত্র সজ্জিত সৈন্যদল বিকট অট্টহাসি হেসে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছে। পূব সীমান্তে জাপানও চুপ করে বসে নেই। সুযোগ বুঝে সেও হাত মিলিয়েছে জার্মানীর সঙ্গে। জাপান ঝড়ের বেগে চীন কোরিয়া, ফরমোসা, মালয়, বার্মা বিজয় শেষ করে ভারতের প্রান্তে এসে হানা দিয়েছে রাত্রির অন্ধকারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সেদিন সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল মালয় আর অন্যান্য পরিত্যক্ত দেশগুলির অসহায় অধিবাসীদের কথা। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

খবরের কাগজে পড়েছি জাপানীদের নৃশংস অত্যাচারের কথা। ওপর থেকে বিষাক্ত বোমা ফেলেছে। যাকে সামনে পেয়েছে চোখের নিমেষে তাকে গুলী করেছে। কোন বাছ বিচার নেই। এই মহাযুদ্ধের কামানের ধোঁয়ায় আমাদের মত কত যে চোখের জলের ইতিহাস মুছে গেছে তার হিসাব কে রাখে? কাকার চিঠি বহুদিন ধরে পাওয়া যায় না। কোন খবর নেই তাঁর। ঠাকুরমা রাতদিন হাউমাউ করে কাঁদেন। কাকীমা গোপনে চোখের জল ফেলেন। আমাকে দেখলে দরদর ধারায় পড়তে থাকে। দুঃখের রোলারে সব সমান হয়ে গিয়েছিল মান অভিমান। তার বুকের নিঃশ্বাসে যেন মহাশ্মশানের হাহাকার বাজে। শবযাত্রীর মত আমরা কয়টি প্রাণী দিনের পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি।

—কাকীমা, কাকা বেঁচে আছেন!—সান্ত্বনার সুরে কখনো বলতাম।

আরো জোরে কেঁদে ওঠেন কাকীমা। চুপ করে যেতাম। কি-ই বা বলবার আছে? ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন বজ্রপাতের মত রেঙ্গুন থেকে বড় কাকার টেলিগ্রাম এসে পৌঁছেছিল। কুয়ালালামপুর শহরের যেদিকে কাকা থাকতেন সেদিকটা জাপানীদের বোমায় চূর্ণ-বিচূর্ণ। একটা লোক বেঁচে নেই, একটা বাড়ী দাঁড়িয়ে নেই।

আষাঢ় মাসের মেঘ যেন কাকীমা, ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়। এবার আরেক রূপ। ঠিক আগের মতন। টেলিগ্রামটা পড়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলেছিলেন সহজ-ভাবে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে এক গাল হাসি—হি-হি-হি।

—কাকীমা!—মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

—কি?

কিছু বলতে পারি নি। কিন্তু পাড়ার লোক সহজে ছেড়ে দেয় নি। একলা পেয়ে জিজ্ঞাসা করত, তোর কাকীমা এখন কাঁদে না কেন রে?

—কি জানি ?

—নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। কি রে ?

বুঝতে পারতাম না কথার মানে। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকতাম। ওরা হেসে উঠত।

দিন কয়েক পর আমাকে ছাদের চিলে কোঠায় নিয়ে গিয়েছিলেন কাকীমা। কিছুক্ষণ চুপচাপ, আমি কিংবা কাকীমা কেউ কথা বলিনি। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় অনেক দিন পর চুলগুলিকে কপালের দু-পাশে খেলা করতে দেখেছিলাম। মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলেছিলেন, বাদল, আমাকে কিংবা তোমার মাকে কেউ যদি বন্দী করে রাখে তবে তুমি কি কর ?

—আমি ? আমি তাহলে—কি যেন বলেছিলাম মনে নেই।

কাকীমার কণ্ঠস্বরে যেন গীটারের আওয়াজ। বলেছিলেন, ভারতবর্ষ আমাদের দেশ, আমাদের মায়ের সমান। অথচ ভেবে দেখ, কত দূরের দেশের কয়েকটা লোক ভারতবর্ষকে পরাধীন করে রেখেছে। নিজের দেশে আমাদের চলবার ফিরবার পর্য্যন্ত স্বাধীনতা নেই। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের কি কোন ভাবনা চিন্তা আছে ? দিব্যি গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। উঃ, এ কিছুতেই সহ্য করা যায় না, কিছুতেই না—বলতে বলতে কাকীমা উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন। আমার মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আকাশের গায়ে রেখে বলেছিলেন, ভেবেছি আমরা এক কাজ করব।

—কি কাজ ?

—আমরা দু-জনে মিলে ভারত স্বাধীন করব।

ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম, তা কি পারব ? ইংরেজের কত সৈন্য—কামান বন্দুক ?

—কেন পারব না ? একা ডি' ভ্যালেরা যদি আয়ারল্যাণ্ড স্বাধীন করতে পারেন তো আমরা দু'জন আছি। খুব পারব। প্রথমে আক্রমণ করতে হবে পুলিশ থানা। তারপর ট্রেজারী দখল করে রাইফেলগুলি কেড়ে নেব। কি পারবে না ?

খুব খুশী হয়েছিলাম মনে মনে। কাকীমা তাহলে আমারই মত। রাত জেগে কত বিপ্লবের বই পড়েছি। বিপ্লবীদের দুঃসাহসিক কার্য্যকলাপ আমার কল্পনার পাখা মেলে দিয়েছে। এবার আর কল্পনা নয়, সত্যি সত্যিই ঘটবে। উৎসাহভরে বলেছিলাম, কাকীমা, আমার কাছে একটা ছোরা আছে।

—দূর পাগল, ছোরা দিয়ে কি হয় ? বোমা চাই, বোমা। বোমা তৈরী করব।

তোমার কাকা যখন কলকাতায় কলেজে পড়তেন তখন স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। একবার বোমার কেসে ধরাও পড়েন। পরে অবশ্য ছাড়া পেয়ে যান। আমার এক ভাই এখনো জেলে। সুতরাং কি করে বোমা তৈরী করতে হয় সে আমি জানি।

এরপর আমিই কাকিমাকে গোপনে গোপনে বাজার থেকে বোমার উপকরণ—গন্ধক, পটাশ, সোরা, স্পিরিট ইত্যাদি কিনে দিয়েছিলাম। চিলে কোঠায় বসে বোমাও তৈরী করেছিলেন—মস্তবড়। তারপর ক্রমে ক্রমে আমাদের সেই অভিষ্ট রাত্রি এসেছিল। যে রাতে আমরা পুলিশ থানা আক্রমণ করব। ট্রেজারী লুঠ করব। ভাবলে এখনো গা শিউরে ওঠে। কিছুতেই ঘুম আসছিল না। বিছানায় শুয়ে কেবল এপাশ-ওপাশ করছিলাম। কখন কাকীমা এসে ডাকবেন? রাত দুটো বাজতে আর কত দেরী? এবার আমার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। বরিশাল স্বাধীন হয়ে গেলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হতেও বেশী দেরী লাগবে না। দলে দলে সবাই আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। সেদিন স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে আমার আর কাকীমার নাম প্রফুল্ল চাকী আর ক্ষুদিরামের নামের পাশে শোভা পাবে। সোনার অক্ষরে অমর হয়ে রইবে। দেশবাসী জানবে দুটি দুরন্ত ছেলে-মেয়ের অপূর্ব্ব দুঃসাহসিক কথা।—ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে জেগে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল, আকাশটা বুঝি ভেঙ্গে পড়ল ছাদের ওপর। ভয়ে আতঙ্কে কি করব কিছু বুঝতে পারছিলাম না। চার-দিকে লোকজনের চিৎকার। হঠাৎ ওপর থেকে এক রকম কাতর গোঙানি ভেসে এল। মনে পড়ে গেল কাকীমার কথা। এক নিঃশ্বাসে চিলে কোঠায় ছুটে গিয়েছিলাম। চিলে কোঠার একটা দিক বিস্ফোরণে ভেঙ্গে পড়েছিল। মেঝের ওপর ইট, কাঠ, চুণ, সুরকীর জঞ্জাল। এর ভিতর ক্ষত বিক্ষত দেহে কাকীমা পড়ে আছেন। মাথার এক পাশ থেকে দরদর ধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ভয়ঙ্কর—বীভৎস দৃশ্য!

আমাদের বীরত্বের কি এই শেষ পরিণতি? বোমা—সে কি তবে নিজেকে মারবার জন্যে? চিৎকার করে উঠেছিলাম প্রাণপনে, কাকীমা—

আমার দিকে তাকিয়ে একটু করুন অথচ তৃপ্তির হাসি হাসলেন। তারপর, সে হাসি মিলোবার আগেই কাকীমা মিলিয়ে গেলেন।

কর্ণিকার

অধ্যাপক শ্রীসুরেশচন্দ্র দে

শ্রীমান্ দিলীপ সাহা

ASUTOSH COLLEGE SPRING SOCIAL, 1956

"GRIHA-PRABESH" : DRAMA GROUP

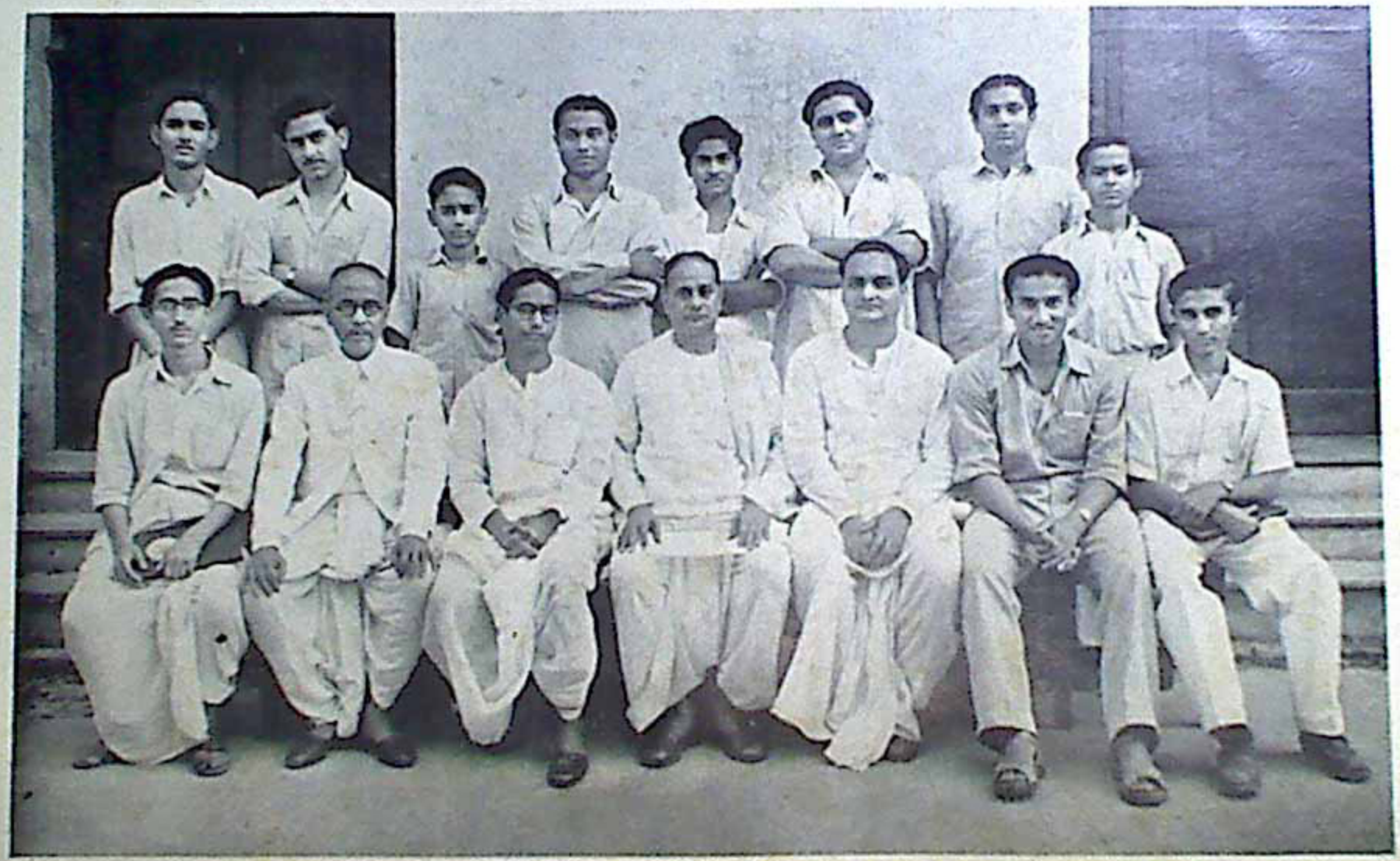

Sitting on Chair (Left to Right) : Gopal Bhattacharjee (Cultural Secretary) ; Vice-Principal R. K. Sircar ; Prof. K. C. Maity (President, Students' Union) ; Principal S. P. Mukherjee ; Prof. S. K. Siddhanta (Prof.-in-charge of Culture) ; Provat Dutta (General Secretary) ; Debdas Mukherjee.

Standing (Left to Right) : Anjan Chakrabarty ; Uddyloke Chatterjee ; Swapan Sengupta ; Priti Ranjan Ghosh ; Salil Roy ; Amar Mukherjee ; Provat Ranjan Ghosh ; Vaskar Mukherjee.

কৃষ্ণপক্ষ

অজয় গুপ্ত

প্রথম বর্ষ। সাহিত্য

রাত এখন বোধ হয় দশটারও বেশী। পাঁচঘণ্টা আগে,—পাঁচটার সময়—বস্তীর প্রায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসা বিচ্ছিন্ন ধোঁয়ার রেখায় রেখায় মাঘের শীতার্ত্ত বাতাসের হিম কণা মিশে গিয়েছিল,—তখন থেকে শীতের অনুভব জেগেছিল। ধীরে ধীরে শীত বেড়েছে। ধোঁয়া—বাতাসে বাতাসে উড়ে মিলিয়ে গেছে; কিন্তু শীত যায়নি,—সারা বস্তীটাকে তার তুহিন আবেষ্টনীতে ঘিরে নিশ্চল হ'য়ে রয়েছে। সন্ধ্যার কোলাহল আগরাতে ক্ষীণ হ'য়েছে, ক্রমে নিঃশ্চুপ হ'তে হ'তে এখন ক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রামের কোলে হ'য়েছে নিমগ্ন।

গলির মুখের বটগাছটা পেরোতে পেরোতে চাদরটাকে গায়ের সঙ্গে নিবিড় ক'রে এঁটে নিয়ে সাবধানে পা ফেললো পাতখুড়ো। সাবধানে না ফেলে উপায় আছে। এতক্ষণ যাহ'ক সরকারী বাঁধান রাস্তায় আসা গেছে। দুপাশের বিজলীর আলো পথ দেখিয়েছে। কোনই অসুবিধে হয়নি। কিন্তু এখন—? এ রাস্তা না পাকা, না কাঁচা। এখানে মাটি, ওখানে খোয়া। কোথাও থক্‌থকে কাদা, কোথাও এবড়োখেবড়ো ইট পাথর।—পোড়ার কর্পোরেশনের দৃষ্টি কি আর পড়ে এদিকে? শুধু কি এই অসুবিধে? একটা লাইট পর্য্যন্ত ভালো নেই! গ্যাসের পোষ্টগুলো নির্বিবাদে কিঞ্চিত ব্যবধানে দাঁড়িয়ে ধ্যান করছে। কোনটাই প্রায় জ্বলে না। কোনটার ম্যান্টেল খ'সে প'ড়েছে তো পড়েছেই। কোনটার বা ভেঙেছে কাঁচ। যা-ও এক আধটা জ্বলে—তা-ও জোনাকির মত,—জ্বল্‌ছে নিব্‌ছে।

গলির মুখেরটাও তাই।

চলতে চলতে হঠাৎ কিসের মধ্যে প্যাচ্‌ ক'রে পা পড়লো পাতখুড়োর। উগ্র পচা একটা দুর্গন্ধ বেরিয়ে এসে ঘৃণায় ভরিয়ে দিল তাকে! শ্লীলতাশূন্য মন্তব্য করলো সে: শালার 'চোরপোরেশন'—হয় সারিয়ে দে জ্বলুক, নয় দে একেবারে নিবিয়ে সব। সাড়ে ছ-আনার টর্চ একটা না জুটবে এমন নয়!—দিলে সব মাটি করে—!

রাগ হবারই কথা। মাসের শেষদিকে এখন পয়সার যা টানাটানি। অতিকষ্টে

৩

তাই থেকে যেটুকু গিলেছে তাতে মন ভরে না। নেশা হয় না। একটু আমেজ এসেছিল মোটে—তাও দিলে ছুটিয়ে!

আরও সাবধানে এগোনো দরকার। তাই করলো সে।

প্রায় নিঃসাড় হ'য়ে ঘুমুচ্ছে সারাটা বস্তী। কেবল মাঝে মধ্যে দু'একটা বাচ্চার ট্যাঁ ট্যাঁ; আর কোন বাড়ীর বাসন ধোয়ার আওয়াজ ছাড়া ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবার কেউ নেই।

শীতটা প'ড়েছে জাঁকিয়ে। চাদরটায় মাথা অবধি মুড়ে দিলে হবে কি; ভেতর থেকে কাঁপুনি আসছে পাতখুড়োর! পরিমাণ আজ খুবই কম পড়েছে—একরত্তি তাতেনি শরীরটা। একেবারে লেপের মধ্যে না ঢুকলে আর গরম হবার জো নেই। —সন্তর্পণেই আরো একটু জোর কদমে চললো পাতখুড়ো। হঠাৎ কি মনে হ'তেই ফিরে দাঁড়ালো,—: বিশের বাড়ীতে একবার ঢুঁ-মেরে যাই। ছেলেটা রইলো কেমন—।

ফেলে যাওয়া পথে কিছুদূর পিছিয়ে এসে, বাঁয়ে একটা অতি অপ্রশস্ত গলিতে ঢুকলো পাতখুড়ো।

বিশের বাড়ী থেকেও কোন সাড়া আসছে না। এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো নাকি! আশ্চর্য্য হ'লো পাতখুড়ো।—তবে বোধ হয় ছেলেটা আগের চেয়ে ভালই আছে! সিঁড়ি বেয়ে দাওয়ায় উঠে এলো পাতখুড়ো। দরজা, জানালা সব বন্ধ—শীতের জ্বালায়।—ভেতরে আলো জ্বলছে কি না, তাও দেখবার উপায় নেই।

আস্তে দরজায় টোকা মারলো। কিন্তু তাতেই দরজাটা ফাঁক হ'য়ে গেল। আর একদফা অবাক হ'লো পাতখুড়ো: এখনো দরজা খোলা!

—কে? ভেতর থেকে বিশের স্ত্রী লক্ষ্মীর গলা শোনা গেল।

—আমি—পাতখুড়ো—বিশে কোথায়?

—সে তো ফেরেনি এখনো।

—এখনো ফেরেনি! এত রাত অবধি কি ক'রছে?—বলে গেছে নাকি কিছু যাবার সময়?—

—না তো, রোজের মতই বেরিয়েছে। ভাবনায় মরি—

—না না, ভাববার কিছু নেই। নির্ভয় আশ্বাস দেয় পাতখুড়ো। তা ছেলেটি আছে কেমন? কথা বলতে বলতে ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে সে।

—আজকের দিনটা ভালই গেল। বললো লক্ষ্মী।

—এই আস্তে আস্তে ভাল হ'য়ে উঠবে। তা আমি এখন যাই—ওঃ বাইরে যাকে বলে, হাড় কাঁপান শীত। তবু ঘরের মধ্যে এসে একটু গরম হওয়া গেল। দরজার দিকে ফিরতে ফিরতে আবার বললো : বিশেও এলো বলে, রাত হ'য়েছে।

দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো পাতখুড়ো। সামান্য নড়ে যাওয়া চাদরটা ভাল করে মাথার উপর দিয়ে এনে কান পর্য্যন্ত ঢেকে নিল,—সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে। শীত পড়েছে বেজায়। চোখের পাতা জ্বালা জ্বালা করছে যেন।

আলোর নামগন্ধ নেই এদিকে। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। তার উপর বয়সের কশাঘাত আরো কয়েকপোঁচ আঁধার বুলিয়ে দিয়েছে পাতখুড়োর দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর। নীচের দিকে চেয়ে অতি সন্তর্পণে পা ফেলতে গিয়ে—কাছেই কার পায়ের শব্দে চম্‌কে সামনে তাকালো পাতখুড়ো। প্রশ্ন করলো—কে ?

—কে ? পাল্টা প্রশ্ন আসে সামনে থেকে।

—ওঃ বিশে ! এলে এতক্ষণে ?

—পাতখুড়ো,— বাড়ী ফিরছ বুঝি !

—হুঁ—এই তো তোমার বাড়ী থেকে আসছি। তা এত দেরী ?

—আর বল কেন ? অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো বিশ্বনাথ ;—দোকানের হাঙ্গামা মিটলো তবে তো এলাম। চলনা ঘরে,—যা শীত, বাইরে দাঁড়ানোর উপায় আছে ? দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে !

—না না, এখন রাত হ'য়েছে। শুয়ে পড় গিয়ে,—রোগা ছেলে নিয়ে লক্ষ্মী অনেকক্ষণ ব'সে ভাবছে। কথা বার্ত্তা যা কাল শোনা যাবে—রবিবার আছে, যেও সজনীর ওখানে। অন্ধকারের বাধা অনেকটা অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে পাতখুড়োর। অতি অস্পষ্টভাবে হ'লেও, সামনে দাঁড়ান বিশ্বনাথের অস্তিত্ব সে উপলব্ধি করতে পারছে। পা বাড়িয়ে, ওর হাত ধ'রে ঘরের দিকে যেতে নির্দ্দেশ দিল বিশেকে।

বাক্যব্যয় না ক'রে ঘরের দিকে এগোলো বিশে।

আর নিকষ অন্ধকারে অস্পষ্ট দৃষ্টি দিয়ে সন্তর্পণে পা ফেলে পাতখুড়োও চললো নিজের বাড়ীতে।

পিচে ঢালা মসৃণ বেলভেডিয়ার রোডের মাঝামাঝি জায়গা থেকে যে পথটা একটা বিরাট বটগাছের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে—সে রাস্তাটার বোধ হয় কোন নাম নেই, আর থাকলেও সেটা মনে রাখবার আবশ্যকতা অনুভব করেনি কেউ।

রাস্তাটার নাম না জানলেও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বস্তীটা কারোই প্রায় অজানা, অচেনা নয়।

বস্তীতে ঢুকবার পথে ওই বটগাছটা। অনেকদিনকার পুরানো গাছ। বয়সের বহুনী বোধ হয় ছাড়িয়ে গেছে আজকালকার মানুষের হিসাবের গণ্ডী, ওর গা বেয়ে বুনো লতা লতিয়ে লতিয়ে উঠে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। অকেজো লতাটার গায়ে ফুটে থাকে সাদাসিধে বেগুনি রঙের অজস্র ফুল, অকেজো তারাও,—গন্ধ নেই, নেই রংঙের বাহার বা দলের সুঠাম অবস্থিতি! গাছটার চার পাশ দিয়েই ঝুরি নেমেছে। কোনটা মাটি ছুঁয়েছে, কোনটা বা নামতে নামতে মাঝ পথেই রয়েছে থেমে।

ওর পাশ দিয়ে পথ গেছে। অপেক্ষাকৃত অপরিসর। কুমিরের পিঠের মতই অমসৃণ। এই পথটা ভেতরে ঢুকেছে। তারপর অভ্যন্তরে একাধিক শাখা, উপশাখা ছড়িয়ে দিয়ে নিজের অস্তিত্ব কখন কোথায় বিলুপ্ত ক'রে দিয়েছে নানা বিশৃঙ্খলার ডামাডোলে। পথের দুপাশে, পাশাপাশি চলে গেছে ঘরের সারি। আঙ্গিক অবস্থা সবারই প্রায় সমান। জীর্ণ কলেবরে সবাই ঘোষণা করছে যে যার দারিদ্র্য। বেশীর ভাগই খাপরার ছাউনী।

সবগুলোই বাসা-বাড়ী নয়। ওরই মধ্যে কোনটা মুদিখানা, তার বাইরে পাতা বোকটায় অষ্টপ্রহর লেগে আছে নানা আলোচনা। অশুদ্ধ নিষিদ্ধ সব রকম। কোনটা ধোপাবাড়ী। দাওয়ার উনোনে সদাই বসান রয়েছে দুটো তিনটে ইস্ত্রি। যেটা কয়লার দোকান—সেটাতে মশার উপদ্রব তো চিরন্তন। শাঁখারীর দরজায় প্রায়ই দেখা যায় দাঁড়িয়ে আছে কেউ। একটু শাঁখের গুঁড়োর আশায়ঃ দাওনা একটু গুঁড়ো—দিদি চেয়েছে। মুখে মাখবে—!

—যা যা কে তোর দিদি! পয়সা দিতে বলগে যা—এমনিতে হয়না—! জবাব প্রায় সবাইকেই সমান দেওয়া হয়।

এরপর সজনীর পানের দোকান। ওর পাশে সরকারী কল। একাধিক বালতি সব সময়েই রয়েছে ওখানে লাইন দেওয়া—জল যখন থাকেনা তখনও। আর জলের সময় রীতিমত হাতাহাতি সুরু হ'য়ে যায়—আগে পরের মামলা নিয়ে। মেয়ে, পুরুষ কমতি যায়না কেউ।—

সজনীর পানের দোকানে দুটো বেঞ্চি পাতা। ওখানেই পাড়ার মোড়লদের আড্ডা বসে। কলের হামলার মধ্যেও বেশ চলে তাদের আলোচনা।

রবিবারে তাদের আলোচনা সুরু হয় অন্যদিনের চেয়ে আগেই। খাওয়া দাওয়ার পর একটু গড়িয়ে নিতে যতক্ষণ যায়; তারপর বিরাট অবসরটা কাটাবার প্রকৃষ্ট পন্থা হ'লো—বারোয়ারী কলের সামনে সজনীর দোকানের আসরটা।

নিত্যকার চারপাঁচজন সমভিব্যহারে পাতখুড়ো বেশ খানিকক্ষণ থেকেই বিশের অপেক্ষা করছে। বিশে এলো অনেক পরে।

—এই যে বিঃ—বি-শে। কথার মধ্যে কাশি আসা পাতখুড়োর ব্যারাম। পানভরা মুখ থেকে থুথু ছিটকে আশেপাশে এর-ওর গায়ে লাগে।

—বড় জ্বালাও তুমি, পাতখুড়ো,—হেসে হাতটা মুছতে মুছতে রাম বললো। এ আসরেরই একজন রাম।

—আরে ভাই, বল কেন। কোন কালে, কোন রামজন্মে ধরেছে কাশিতে। ধরেছে তো ধরেইছে। লয় ক্ষয় নেই। —তারপর বোস, বিশ্বনাথ,—হাতের চেটোটা সিক্ত রঙিন দু ঠোঁটে বুলিয়ে নিতে নিতে বললো পাতখুড়ো: তা ছেলেটা ভাল আছে তো?

না ব'সে, পাতখুড়োর সামনে দাঁড়িয়ে, এতগুলো কথার পরে প্রথম কথা বলার সুযোগ পেয়ে বিশ্বনাথ বললো—না, বসবো না, পাতখুড়ো। সকাল থেকে ছেলেটা যেন কেমন করছে। লক্ষ্মী যা ভয়কাতুরে—পাঠিয়ে দিলে তোমার কাছে—।

—তাই নাকি? উৎকণ্ঠাকীর্ণ স্বর পাতখুড়োর। ভুলেও মনে হবে না,—এ-ই ক্ষণপূর্ব্বের পরিহাস তরল পাতখুড়োর কণ্ঠস্বর। চল—চল। বোসো হে তোমরা। বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো পাতখুড়ো।

চার চারটে যুগ পার করে দেওয়া যে পাতখুড়ো আজ বৃদ্ধের পর্য্যায়ে পড়ে, তার উপর এ বস্তীর প্রায় লোকেরই কমবেশী ভরসা আছে। যদিচ তার জীবনের তিন পর্য্যায়ের কোনটাতেই অদ্যাবধি সুনাম কিনতে পারেনি সে। দুর্নাম, অপযশের কালীমায় জর্জরিত ক্ষীণদেহ এই মানুষটিকে তবুও লোকে চায়। নিজেদের বিপদে তাকে ডেকে তারা বল পায়, আনন্দে উৎসবে ভাগ দিয়ে মনকে আরো খুসীতে ভরপুর করে তোলে। তার সারা দেহ অত্যাচারের কলুষে থাক না কলুষিত হ'য়ে। রাতে দেশী মদের আড্ডায় থাক্ শোনা তার জড়িত প্রলাপ, তবুও মদ, অনাচারের সঙ্গে অপরের সুখ দুঃখকে যে নিজের করে নিতে পারে, তাকে চাইবার মধ্যে কোন দোষ নেই। সবাই তাই চায় পাতখুড়োকে।

এখন দিন। সূর্যের কিরণ সরাসরি না পড়লেও আলোর অভাব নেই।...এখানে

ওখানে দুচারটে ডাষ্টবিন্ রয়েছে ; কিন্তু সেগুলো সম্পূর্ণ শূন্য। ময়লা যত সব আধার ছাড়িয়ে ছড়িয়ে আছে নানা স্থানে,—এধারে ওধারে। এপাশে ওপাশে কাগজের মোড়কে গড়াগড়ি যায় মহামূল্য সব সম্পদ। ময়লায় মাছি বসে। শুয়োরগুলো, আর দুটো একটা কুকুর খাবারের লোভে তাতে হানা দেয়। মাছিগুলো উড়ে যায়। পচা আবর্জনা ক্ষণিকের জন্য উগ্রতর হ'য়ে চরম ঘ্রাণ বিকীর্ণ ক'রে বাতাসে মিশে।

চলতে চলতে বিশ্বনাথ বললো—কাল কি ফ্যাসাদেই না পড়লুম পাতখুড়ো—!

—ওহো—হ্যাঁ-হ্যাঁ বলতো ব্যাপারটা। কাল তো শোনাই হ'লো না! বিশের কথায় আগ্রহ প্রকাশ করে পাতখুড়ো।

বিশে বলতে লাগলো—হঠাৎ কাল আমাদের দোকানে পুলিশ হানা দিল—

—পুলিশ? কেন—?

—আমরা নাকি ভেজাল ওষুধ বিক্রী করি। তারা খবর পেয়েছে—তাই দোকান তালাস করতে এসেছে। তা নিয়ে এক বিরাট হৈ চৈ। দোকানটা তছ্‌নছ্ করলো অথচ পেল না কিছুই। আর পাবেই বা কোথা থেকে। এদিকে আমাদের দোকানের পসারতো জানোই। আমরা নাকি করি জাল ওষুধের কারবার?

—তা—হঠাৎ এমন মনে করবার বা কি কারণ?

—তা ওরাই জানে! কাজের কাজ তো নেই। যত সব—!

—হুঁ, ওই প্রসঙ্গের উপর যতি টানলো পাতখুড়ো। দুবার কেশে নিয়ে তারপর বললো—ছেলের বাড়াবাড়ি মানে, কি—রকম—?

—কি জানি; আমি কি ছাই দেখেছি ভাল ক'রে। কালকের হাঙ্গামার কথা ভেবে মরি—। লক্ষ্মী বললে, ওর যেন মনে হচ্ছে, কাল থেকে বেশী ছট্‌ফট্ করছে আজ। তাই ডাকতে বললে তোমাকে!

ইতিমধ্যে বিশ্বনাথের বাড়ীর সীমানায় এসে পড়েছে তারা।

—তুমি যাও ঘরে। আমি আসছি—বলে, বিশে পাতখুড়োকে ঘরের দিকে যেতে নির্দ্দেশ দিল।

ভেতরে ঢুকে পাতখুড়ো রোগীর গায়ে, পিঠে হাত বুলালো। তারপর নাড়ী দেখলো। কিঞ্চিত উদ্বেগের ছায়া পড়লো তার মুখমণ্ডলে।—বাইরে এসে ডাকলো—বিশে।

—আমার মনে হয়, ডাক্তারকে আনো,—বললো পাতখুড়ো। আর তোমার তো অসুবিধে নেই—দোকানের ডাক্তারকেই ডেকে আনতে পারবে।

বিশ্বনাথ রাজী হ'লো। দুজনে আবার একই সঙ্গে বেরুলো। বিশে চললো ডাক্তারকে ডাকতে, পাতখুড়ো নিজের আড্ডায়।

সজনীর পানের দোকানে, পাতখুড়োর অভাবে অপেক্ষমান মোড়লরা অস্থির হ'য়ে পড়েছে। পাতখুড়ো না হ'লে তাদের একদণ্ডও চলে না। দুটো মজার কথা, রসালো উক্তি—এ বলবার, শুনবার জন্যেই তো এখানে আসা। তাই যদি না হ'লো তবে আর এখানে এসে লাভ কি!···কলে জল এসেছে, ভীড় হ'চ্ছে ক্রমে মেয়ে পুরুষের।

পাতখুড়োকে আসতে দেখেই তারা সমস্বরে কোলাহল ক'রে উঠলো—এসো পাতখুড়ো—তুমি ছাড়া আসর আর কে জমায় বল? স'রে স'রে বসে তারা জায়গা ক'রে দিল। রাম বললো: পান লাগাও হে সজনী।

কাছে এসে পাতখুড়ো বললো—না হে আর বসা-টসা ভালো লাগে না।—ছেলেটার অসুখ যেন বাড়াবাড়ি মনে হ'লো—। উদ্বেগ সংশয়ে আচ্ছন্ন তার কণ্ঠস্বর।

—আরে বোসো বোসো—যাদের অসুখ তারা বুঝবে। তুমি কেন এত মাথা ঘামাও। এদিকে কল তলার দিকে চেয়ে দেখ!

বাস্তবিক চেয়ে দেখবারই বস্তু বটে। রোজ দেখা, পুরণো। তবুও আশ মিটে না। কালোর মধ্য থেকে যারা কালোকেই বেছে নিল অন্তর রঞ্জনের জন্য, ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ বুঝবার বিচার শক্তিকে ইচ্ছে ক'রেই তারা দিল জলাঞ্জলি। জলের কাড়াকাড়ির মধ্যে প্রৌঢ় মনের জীর্ণ সজ্জায় নতুন রঙের স্বপ্ন যারা ছড়াতে চায় তাদের কাছে এই দ্রষ্টব্যের নতুনত্ব তো কোনদিন ঘুচবে না!

—ওকি একটা কথা হ'লো রাম। রামকে উপলক্ষ্য ক'রে কথাটা বলা হলেও—পাতখুড়োর বার্ধক্যের প্রথম ধাপ অতিক্রান্ত অস্পষ্ট ঘোলাটে চোখ দুটো শ্রেনের প্রখরতা নিয়ে ঠিকরে পড়লো ওই কলতলাতে—ভালয় মন্দয় যদি সবাইকে না-ই দেখলুম তবে আর হ'লো কি? সজনী ততক্ষণে পান তৈরী ক'রে দিয়েছে। সেটাকে মুখে পুরতে পুরতে আবার বললো—এই তো বিশেকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে তবে এলাম।—

আরো অনেকক্ষণ সজনীর দোকান দখলে রাখলো তারা। ক্রমে রোদের প্রখরতা এলো কিমিয়ে। হাইড্রেন্টে পাইপ লাগিয়ে কর্পোরেশনের লোক রাস্তা ধুইয়ে গেল। তার পরেও খানিকক্ষণ বসে রইল। কিন্তু বসাই সার হ'লো। ভাঙা হাট নতুন করে আর বসলো না। বসলো না পাতখুড়ো।

তারপরে উঠলো সবাই।

—দিনটা একেবারে নিরামিষই গেল,—বিরক্তি প্রকাশ করলো একজন।

বাড়ী যাবার পথে বিশ্বনাথের বাড়ী হ'য়ে গেল পাতখুড়ো।

বিশের হাতে প্রেস্‌ক্রিপশন্ দিয়ে ডাক্তারবাবু তখন ঘর থেকে বেরুলেন।

—নমস্কার। জোড়া হাত কপালে ছোঁয়াল পাতখুড়ো।

—নমস্কার। প্রতিনমস্কারের বেলায় কেবল সামান্য একটু মাথা নাড়লেন ডাক্তারবাবু।

—কেমন দেখলেন? আবার প্রশ্ন করে পাতখুড়ো।

চলতে চলতে ডাক্তারবাবু বললেন—ভয়ের নেই কিছু। ওষুধ দিয়ে গেলাম,—কাল আবার খবর দেবেন!

: আচ্ছা।

পাতখুড়ো ঘরে চলে এলো। বিশ্বনাথ তখন ওষুধ আনতে যাচ্ছে। তার হাত থেকে প্রেস্‌ক্রিপশনটা নিতে নিতে পাতখুড়ো বললো: আমার কাছেই দাও বরং টাকাটা। ওষুধটা আমিই নিয়ে আসি। তুমি এই হাঁটাহাঁটি করে এলে।

বিশের আপত্তি করলো না বিশে। পাতখুড়োর হাতেই ওষুধের দামটা দিয়ে দিল সে।

পাতখুড়ো চলে গেলে স্ত্রীকে বলে—বুঝলে লক্ষ্মী, কালকে বাড়ীতে পুলিশ আসতে পারে।—আমি থাকবো না,—দোকানে আমার জরুরী কাজ—।

বিস্মিত হ'য়ে লক্ষ্মী বলে: পুলিশ আসবে কেন, বাড়ীতে আবার!—না বাপু আমার তো এখন থেকেই ভয় লাগছে—ঘরে রোগা ছেলে! কাজ নেই তোমার দোকানে গিয়ে!—

—আরে না না, ভয় পাবার কিছু নেই। হয়তো ঘরটা সার্চ্চ করবে।—আশ্বাস দিল বিশ্বনাথ,—কাষ্ঠ হাসি মুখে এনে।—আর পাতখুড়োকে বলে যাবখ'ন। দেখ না, যত সব বাজে হাঙ্গামা। কোথাকার কোন দোকানের এক কর্মচারী গোপনে ভেজাল ওষুধ বিক্রী করে,—খবর পেয়ে পুলিস এসে হানা দিল আমাদের দোকানে।—আরে বাপু আগে ভাল করে জান।—তল্লাটে আমাদের নামকরা দোকান—এ সব জোচ্চুরির কাজ করবো আমরা?—কথায় দোকানের সুনাম যতখানি প্রকাশ পেল—হাবভাবে ততটা গর্বিত কিন্তু হ'তে পারলো না বিশ্বনাথ।

ওষুধ নিয়ে ফিরবার পথে হঠাৎ একটা কথা মনে হ'লো পাতখুড়োর—শনিদেবের মন্দির থেকে একটু চরণামৃত ঠেকিয়ে নিয়ে চলে গেলে হয় ওষুধের শিশিটায়!

এই পাঁচমিশালী পাড়াটার মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে সেই মন্দির। দরজার একপাশে হলদে সাইনবোর্ড ঝুলছে: ওঁ শনৈশ্চরায়। বামুন পঞ্চানন চাটার্জী সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যার পরেও খানিকক্ষণ বসে থাকে। যে আসে—সাধ্যমত দুটো একটা পয়সা থালায় ফেলে দেয়। পঞ্চানন কুশিতে তুলে তার হাতে সামান্য চরণামৃত নেয়। চাইলে কাউকে বা দুটো প্রসাদী ফুল। পঞ্চানন যুদ্ধের পরে ব্রাহ্মণ হয়েছে। কিন্তু ভক্তি তার কম আছে—এমন কথা বলবো না। চন্দনের পত্রলেখায় সারা মুখমণ্ডল তার সুচিত্রিত। কানের পাশে সদাই গোঁজা প্রসাদীফুল। পাড়ার বিশ্বাসের স্তম্ভ যেন পাতখুড়ো, ঠিক তেমনি এই শনিদেবের মন্দির আর পঞ্চানন চাটার্জী।

দরজায় জুতো খুলে রেখে, খানিক এগিয়ে গিয়ে একটা তামার পয়সা থালায় রাখল পাতখুড়ো। তারপর চরণামৃত শিশিটায় ছুঁইয়ে দুটো ফুল বেলপাতা নিয়ে চলে এলো।

ঘরে ঢুকেই পাতখুড়ো বললো—বুঝলে বিশ্বনাথ, আসবার পথে মন্দির থেকে একেবারে ঠাকুরের চরণামৃত ছুঁইয়ে নিয়ে এলুম। আমরা হিন্দু—ডাক্তার বল, কবরেজই বল, ঠাকুরের ভরসাই আমাদের সবচেয়ে বড় ভরসা। কি বল, তাই না?—বিশ্বনাথের সমর্থনের জন্য অপেক্ষা করলো না পাতখুড়ো—বোতলসুদ্ধ হাতটা এগিয়ে দিয়ে বললো—ধর ওষুধটা—বাড়ী থেকে চুঁ মেরে আসি!

পাতখুড়ো চলে গেল তারপর। যাবার আগে বলে গেল—দরকার পড়লেই খবর দিও—।

বাড়ী আসার বিশেষ দরকার ছিল পাতখুড়োর। বুকের অনেক দিনকার পুরোন ব্যথাটা আবার চাড়া দিয়ে উঠেছে। কয়েক ঘণ্টা ভোগাবে। কতক্ষণ করতে হবে মালিশ। তারপর একটা বালিশকে আঁকড়ে ধ'রে রাখবে বুকের সঙ্গে। ব্যথার অবশ্য উপশম এতে হয়না বললেই চলে। সময় হ'লে আপনিই সারে। এটা নেহাৎই মনের সান্ত্বনা। ব্যথাটা সামলেও সারারাত অবিশ্রাম কাশি চলবে। তার সঙ্গে উঠবে কফ। শিয়রে একটা টিনের কৌটো থাকে এ সময় ছাই দেওয়া। পাতখুড়ো সকালে উঠে প্রায়দিনই নিজের হাতে পরিষ্কার করে কৌটোটা; কোনদিন তার উঠতে দেরী হলে, করে তার বিধবা বোন সুরুচি। সুরুচি দেখে,—ছাইয়ের মধ্যে কেবল কফই রয়েছে তা নয়। সেই বিবর্ণতার মধ্যে সে স্পষ্ট দেখে লালচে আভায় পরিচিত এক মৃত্যুমুখী বিপদের সঙ্কেত।

দাদা উঠলে বেদনা ভরা দৃষ্টিতে একবার সে তার চোখে চোখ রাখে। স্পষ্ট অপরাধ স্বীকৃতির অভিব্যক্তিতে অপ্রস্তুত হয় পাতখুড়ো।

সুরুচি বলে—দাদা তিলে তিলে ক্ষয়ে এমনি ক'রে নিজের জীবনকে নষ্ট ক'রনা,—আমি যেমন করে পারি টাকা জুটিয়ে দেব, তুমি হাসপাতালে চলে যাও। ব্যথায় ভ'রে ওঠে তার কণ্ঠ।

কিন্তু বোধ করি তার চেয়েও গভীর মর্মবেদনায় প্রপীড়িত পাতখুড়ো স্বয়ং। অন্ততঃ তার কথা শুনে তাই মনে হয়—হাসপাতালে যাইনা, সে কি আর টাকার জন্যে রে, সুরুচি। কটা দিনইবা আর বাঁচব। এখানে রয়েছি সব এক সঙ্গে,—সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে ওই অজানা অচেনা লোকের মধ্যে মরার আগেই মরবার জন্য কেন গিয়ে পড়ে থাকবো বল্। যে কদিন বাঁচি তোদের মধ্যেই বাঁচি—যাইনে শুধু এই জন্যে।

পাতখুড়োর এই কাল রোগের কথাটা প্রায় গোপনীয়। রাজধানী ক'লকাতা আলোময় সহর। তারই একান্তে, নিভৃতে বিষাক্ত কৃষ্ণপক্ষের ক্রমঘনায়মান অন্ধকার। সেই অন্ধকারের সুযোগে যত পঙ্কিলতা, কুশ্রীতা মানবিকতার যত কিছু বিকৃত দান, নির্বিরোধ মিছিলে সব মিশে একাকৃতি হ'য়ে যাচ্ছে সেই ঘনঘোর অন্ধকারের সঙ্গে বিরাটাকার এই বিড়ম্বনার একটি ক্ষুদ্র অংশ পাতখুড়ো। লোকচক্ষের অন্তরালে মৃত্যুবীজ তাকে ক্ষয় করে বাসা বাঁধছে,—ক্রমেই বাড়ছে তার কলেবর,—নদী স্রোতের ক্ষয়িত পলি মোহনায় এসে জমা হবার মত।

আজও পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ঘটলো। সকালে কৌটো পরিষ্কার করতে গিয়ে,—ব্যথিত অনুযোগ জানালো সুরুচি।

পাতখুড়ো জবাব দিল, ক্ষুণ্ণ অথচ ঈষৎ রাগত স্বরেই—আচ্ছা বাপু, আচ্ছা। তাই যাব, দুটো দিন আর সবুর কর। বিশের ছেলেটা সেরে উঠুক! ওই হাসপাতালের নরকেই যখন আমায় মারতে চাস—তখন তাই হবে—!

বেলা খানিক বাড়লে, বিশ্বনাথ না ডেকে পাঠালেও পাতখুড়ো নিজে থেকেই গেল ওদের বাড়ী। বিশে তাকে দেখে বললো—এই যে পাতখুড়ো! —এসে গেছ, আমি যাচ্ছিলাম তোমার ওখানে।

—কি ব্যাপার? শুধালো পাতখুড়ো।

—দোকানে একবার আমার এক্ষুনি না গেলেই নয়। লক্ষ্মী বলছিল, একা একা থাকতে ওর ভয় ভয় লাগছে। ছেলেটার আবার বেড়েছে কি না!

—তাই নাকি? ওষুধ খেয়েও বাড়লো কেন? —তা হোক, তুমি যাও। আমি আছি ভয় নেই,—আশ্বাসভরা স্বরে বললো পাতখুড়ো।

বিশ্বনাথ আলমারী থেকে গোটাকয়েক শিশি গুণে হাতব্যাগে ভ'রে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ছেলেটার ছট্‌ফটানি কিন্তু ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

—সকালে ওষুধ খাইয়েছিলে? জিজ্ঞাসা করলো পাতখুড়ো।

—না, নটার সময় খাওয়াবার কথা, লক্ষ্মী বললো।

—নটার সময়! নটা কি আর ব'সে আছে! দাও শীগ্‌গির ওষুধ ঢেলে,—তাইতো কাত্‌রাচ্ছে এত!

আলমারীর কাছে গিয়ে লক্ষ্মী শিশি থেকে ওষুধ ঢেলে নিয়ে এলো। পাতখুড়ো খাইয়ে দিল সেটা।

কিন্তু ছট্‌ফটানি তাতে বাড়লো বই, কমলো না। লক্ষ্মী ভয় পেয়ে বললো—আপনি বরং ডাক্তারবাবুকেই ডেকে নিয়ে আসুন!

প্রস্তাবটা পাতখুড়ো যেন শ্রেয়স্কর মনে করলো, বললো—আচ্ছা তাই বরং যাই—!

তাই গেল পাতখুড়ো।

যাবার পথের মাঝখানে, হাতব্যাগের মধ্য থেকে ওষুধের শিশি বার ক'রে ক'রে দেখতে থাকে বিশ্বনাথ, সব ঠিক আছে কিনা! হঠাৎ একটা শিশি বার করতেই অস্বাভাবিক বিবর্ণতায় সারামুখ ছেয়ে গেল বিশ্বনাথের। এই শিশিটা এলো কেমন ক'রে? এটা তো খোকার ওষুধ,—পাতখুড়ো যেটা নিয়ে এলো কালকে! এ ক'রেছে কি সে? এতক্ষণে খোকার আর একবার ওষুধ খাবার সময় হ'লো! যদি ওরা না খেয়াল করে, আলমারীর ওই শিশিটার ওষুধই খাইয়ে দেয়! সর্ব্বনাশ! ধড়াস্ করে উঠলো বিশ্বনাথের বুক! তা হলে—! ওযে বিষের মত কাজ করবে! অকরুণ ভাগ্যলিপির নির্ম্মম বিধানের বেড়াজালে বিশ্বনাথের অসহায় পিতৃহৃদয় মূক ক্রন্দনে বিধুর হ'য়ে উঠলো। সে ধারণাটা স্বপ্নের অসাধ্যতার মধ্যেও তার মনে উদয় হয়নি কোনদিন, সেটাই যে আজ কঠোর বাস্তবের পটভূমিকায় ঘটে যাবে—তা কেমন ক'রে জানবে বিশ্বনাথ!···আবার বিচলিত পদক্ষেপে সে বাড়ীর দিকে চললো।···

গলির মোড়ে আসতেই নজরে পড়লো বটগাছটার এপাশে বড় রাস্তায় একটা পুলিশভ্যান দাঁড়িয়ে!

এক আতঙ্কে আর একের সংযোজন হ'লো! বিশ্বনাথের গলা মরুভূমির মত শুকিয়ে এলো,—উপবাসীর মত ক্লিষ্ট মনে হ'লো তার সারামুখমণ্ডল!—

সবার অলক্ষ্যে একপাশ দিয়ে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকলো সে। কিন্তু কয়েক পা যেতেই দেখলো জন কয়েক পুলিশের সঙ্গে আসছে রাম। তাকে দেখেই ব'লে উঠলো—এই তো বিশ্বনাথ!

অতি দ্রুত লয়ে স্পন্দিত হয় বিশ্বনাথের বুক। ভয়ে আবার সে পাশ কাটাতে চায়, কিন্তু পারে না। ততক্ষণে পুলিশ কজন এগিয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করে—আপনিই তো বিশ্বনাথ দাস?

বিশুষ্ক কণ্ঠ হ'তে ক্ষীণ স্বর বেরিয়ে এলো বিশ্বনাথের—হ্যাঁ—!

—জাল ওষুধ বিক্রীর অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হ'লো! বক্তা এগিয়ে গিয়ে হাতকড়া লাগিয়ে দিল আসামী বিশ্বনাথের হাতে।

বাড়ী পর্য্যন্ত আর যাওয়া হ'লো না বিশ্বনাথের। দেখা হ'লো না ঘরের মুমূর্ষু ছেলের কতখানি সর্ব্বনাশ সে করেছে! বদলে, তাকে যেতে হ'লো আত্মঅপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে।···

পথে দেখা পাতখুড়োর সঙ্গে। ডাক্তার নিয়ে ফিরছে সে। বন্দী অবস্থায় পুলিসের হাতে বিশেকে দেখে হতবাক্ হ'য়ে গেল সে। পাশ দিয়ে যাবার সময় বললো বিশ্বনাথ—ছেলেটা রইলো পাতখুড়ো দেখো—!

এতক্ষণে একটা কথা খুঁজে পেল পাতখুড়ো। বললো—তোমার কোন ভয় নেই! এই তো ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যাচ্ছি,—ঠিক সারিয়ে তুলবো। আশ্বাসের দৃঢ়তা আবার ফিরে এলো পাতখুড়োর মধ্যে।

বিশ্বনাথ চলে গেল।···

ডাক্তারবাবুকে নিয়ে বাড়ীর দিকে চলতে লাগলো পাতখুড়ো। চলতে চলতে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—উনি কে?—পুলিশ ধ'রে নিচ্ছে কেন?

—ও বিশ্বনাথ। যাকে দেখতে যাচ্ছেন সে ওরই ছেলে। তারপর পাতখুড়োর নিজের মনে, বিশ্বনাথকে ধরবার যে অনুমান খাড়া হ'য়েছে তাই বললো—বিশ্বনাথ ওষুধের দোকানে কাজ করে। কাল নাকি জাল ওষুধ বিক্রীর মিথ্যে সন্দেহে পুলিশ ওদের দোকান খানাতল্লাস করে—তাই—

—ওঃ—ডাক্তারবাবু বুঝলেন ব্যাপারটা। এমন ঘটনা তাঁর কাছে নতুন নয়।···

—রোগীকে পরীক্ষা ক'রে কিন্তু গম্ভীর হ'য়ে গেলেন ডাক্তারবাবু। পাতখুড়ো সেটা লক্ষ্য ক'রে ব্যস্ত হ'য়ে বললো—কেমন দেখছেন ডাক্তারবাবু?—

সে কথার উত্তর না দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন: এর আগে কোন ওষুধ খাইয়ে ছিলেন?—

—হ্যাঁ, বলে পাতখুড়ো লক্ষ্মীকে শিশিটা আনতে বলতে গিয়ে দেখে সে ঘরে নেই। ডাক্তারবাবুকে দেখে সে পাশের ঘরে গেছে। পাতখুড়ো নিজেই উঠে গিয়ে শিশিটা নিয়ে এলো—এই যে এই ওষুধটা—!

—এইটা! অপার বিস্ময়ে ভরপুর ডাক্তারের কণ্ঠস্বর—লেবেল নেই, মার্কস্ নেই—এটা কি ওষুধ?

—তাইত! অবাক পাতখুড়োও বড় কম হয়নি!—এতক্ষণ তো খেয়াল হয়নি। কিন্তু লক্ষ্মী তো এ থেকেই ওষুধ ঢেলে দিল!

এ কথায় কান দিলেন না ডাক্তারবাবু। তিনি ওষুধটা পরীক্ষা করতে থাকেন।··· খানিকবাদে বললেন—পুলিশের সন্দেহটা মিথ্যে নয়। আর আপনার বিশ্বনাথও নির্দ্দোষ নয়।—অনেকের, অনেকদিনের সর্ব্বনাশের অভিশাপ আজ নিজের ছেলের উপরেই এসে পড়েছে! যেটা ওকে খাইয়েছেন, সেটা ওর কাছে ওষুধ নয়—বিষ—!

—কি বললেন? আর্তনাদ ক'রে উঠলো পাতখুড়ো! প্রবল উত্তেজনায় জীর্ণ বুকের প্রকোষ্ঠ ভেদ ক'রে পুরনো রোগটা মাথা চাড়া দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো—থক্—!—শুধু এ-ই নয়—বাসা ছেড়ে বেরিয়ে এলো মৃত্যুদূত—একতাল জমাট রক্তপিণ্ডের আকারে—। প্রবল বেদনায়, নিরর্থক বুকটা হাতে চেপে বসে পড়লো সে।

ভূত দেখে যেন চম্‌কে উঠলেন ডাক্তার—এ কি!··

অভিজ্ঞ ডাক্তরকে বেশীক্ষণ পরীক্ষা করতে হ'লো না। মুহূর্তেই তাঁর কাছে সব পরিষ্কার হ'য়ে ধরা পড়লো। বললেন—ক'দিন পুষে রেখেছেন, এ রোগ?

—অনেকদিন। ক্ষীণ বেদনার্দ্র স্বরে বললো পাতখুড়ো, শীগ্‌গিরই ধরা দেব ভেবেছিলাম, শুধু ছেলেটা সেরে ওঠার অপেক্ষা—

—ভাল করেননি। খুব ক্ষতি করেছেন, শুধু আপনার নয়, অনেকের!—

তার পরের ঘটনা নিতান্তই সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত। গলির মুখের, বটগাছের কাছে একখানা ট্যাক্সিতে পাতখুড়োকে নিয়ে তুললেন ডাক্তারবাবু। গাড়ীতে উঠবার সময় পাতখুড়ো বললো—ছেলেটার কি হবে ডাক্তারবাবু—!

—আমাদের আর হাত নেই, ওর বাবাই ওকে—

আর কোন কথা বলে না পাতখুড়ো। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার জীর্ণ, ভগ্নহৃদয় বিদীর্ণ ক'রে। নিয়তি নিপীড়িত বিশ্বনাথের মনের যেটুকু আশা এতক্ষণ বেঁচেছিল পাতখুড়োর মধ্যে—তা তারই নীরব তপ্ত হতাশ্বাসের মধ্যে দিয়ে এখন শূন্য হ'য়ে মিলিয়ে গেল। হঠাৎ স্বগত উক্তির মত অস্পষ্ট স্বরে পাতখুড়ো বলে ওঠে—আমার কথা রাখতে পারলুম না বিশ্বনাথ,—ক্ষমা করো!—

অজ্ঞতার ঠুলি পরে, কৃষ্ণপক্ষের নিরন্ধ্র অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে লুকিয়ে আছে যে নারকীয় বীভৎসতা, সেত এই পৃথিবীরই প্রতিবেশী। হঠাৎ আলোর উল্কাপাত যদি সেই প্রতিবেশী নরকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন করে দিতেই আবির্ভূত হয়, তবে সে ত এ পৃথিবীরই কল্যাণে! জন কয়েক হতভাগ্যের হতাশ তপ্ত নিঃশ্বাস যদি দেয়ও আকাশ বাতাসকে উত্তপ্ত ক'রে তো দিক! তবুও এ-ই কল্যাণের—

ডাক্তার বাবুর আদেশ পেয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার তার গাড়ী চালিয়ে দিল হাসপাতালের দিকে—!

বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির-বিন্দু।

—রবীন্দ্রনাথ

মাটির টান

সুকুমার ভট্টাচার্য্য

প্রথম বর্ষ। বিজ্ঞান

মাটিকে তারা ভালবেসে এসেছে—আজো ভালবাসে।

কথাটা খুব সামান্য, কিন্তু খুবই সত্যি।

কার্ত্তিকের শেষাশেষি। পড়তি শীতের মাস। বেলা যেন ঢলে ঢলে পড়ে। জলহীন শরৎ শেষের শুভ্র মেঘ আকাশের গায় এদিগন্ত থেকে ওদিগন্ত পর্য্যন্ত ছোটাছুটি করে বেড়ায়। পাঁচু কাজ করতে করতে একবার ঢলে পড়া সূর্য্যের দিকে চেয়ে তারপর নিজের হাতের লোমকূপ গুলোর দিকে চেয়ে অনুমান করে নেয় সন্ধ্যে হ'তে আর কত বাকী। কিন্তু সন্ধ্যা তখন বেশ হয়ে গেছে। বলদ দুটো অদূরে তাদের দুটো ডাগর ডাগর সজল পলকহীন চোখে কিছুটা আশ্চর্য্যের দৃষ্টিতে প্রভু পাঁচুর দিকে চেয়ে আছে। তাদের চাঞ্চল্য—গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনে; প্রতি অঙ্গে ফুটে উঠেছে তারি অনুকম্পন। সামনের দু'টো পা অনবরত মাটি সরাতে সরাতে বেশ কিছুটা গর্ত্ত করে ফেলেছে। লেজ গাছা অনবরত নিষ্প্রয়োজনে একবার পিঠের এধারে একবার পিঠের ওধারে চাপড়াচ্ছে। কান দু'টো তাদের হয়ে উঠেছে একেবারে খাড়া—যেন ঠিক পাঁচু সেই একটা আদেশের অপেক্ষায় উৎসুক।

বেশ কিছুক্ষণ পর হঠাৎ পাঁচুর একবার তরবড়িয়ে উঠে কালো বলদটার গায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল—কেলে, বলতে হ'ত এতক্ষণ, আমার যে খেয়ালই ছিলনা, এই দেখ মিছে মিছি কত বেলা করে ফেললাম। মিছি মিছিই অবশ্য। আজ বাদে কাল কি পরশু, বড় জোর তরশু, যে একটা ভালদিন দেখে ধান কাটতে শুরু করবে তার আবার এ ক'দিন কী এমন কাজ থাকতে পারে? কিন্তু তবুও পাঁচুকে আসতে হয় এই খেতে। পাঁচুকে যেন কে টেনে নিয়ে আসে। হয় ত পাকা ধানের গন্ধ, হয়ত পুরুষানুক্রমের সেই মাটির টান, ধূসর মাটির স্নেহ।

হেমন্তের সন্ধ্যার সেই ফুর ফুর করে মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সঙ্গে নিয়ে আসছে কিসের যেন একটা বেশ সুন্দর গন্ধ। এ-গন্ধ পাঁচু চেনে। কোথাথেকে আসছে তাও সে ভালই জানে। বার কয়েক বেশ বড় বড় করে

পাঁচু দু'টো নিশ্বাস নিয়ে ছড়িয়ে দিল তার সমস্ত অঙ্গে। মনটা ভরে উঠল ভারি আনন্দে। মুখের পেশী গুলোয় ফুটে উঠল তারি প্রতীক।

পাঁচুর পথ চলার আলোচনা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পাঁচু তারি রেশ নিয়ে বলল—শোন কেলে,—বলেই ভোলের দিকে চেয়ে বলল—তুইও শুনিস। ভোলে হঠাৎ প্রভুর মুখে নাম শুনে ঘাড়টা তুলে চেয়ে রইল প্রভুর দিকে। পাঁচু সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড়ের ওপর হাত রেখে তার গলকম্বলে হাত বোলাতে বোলাতে নিজের বুকের কাছে একবার টেনে এনে তারপর ছেড়ে দিয়ে বলল—এই বলছিলাম, বুড়ো হ'লে মানুষের ভীমরতি হয়, নারে? ওরে আমি বুঝি—আমারই সেই ভীমরতি হয়েছে।

ক্ষেত থেকে তার বাড়ী খুব দূরে না হ'লেও খুব কাছে নয়। কেরোসিনের কুপিটা দাওয়ার ওপর একটা বাঁশের খুটির পাশে জ্বলছে। তেঁতলির মা, রমা, এতক্ষণ তেঁতলির সঙ্গে কী নিয়ে কথা কাটাকাটি করছিল। পাঁচু দাওয়ার সিঁড়ির পাশে এসে দাঁড়াতেই রমা তাড়াতাড়ি উঠে এসে সিঁড়ির পাশে পাঁচুর মুখ হাত পা ধোবার জলের বালতিটা এগিয়ে দিল। আর ওদিকে কেলে আর ভোলে তাদের নিজের জায়গায় গিয়ে বিকেলে তেঁতলির হাতে বিচুলি মাখা গামলায় মুখ দিয়েছে।

পাঁচু তেঁতলিকে পুতুল বলে ডাকে। পুতুল কিন্তু বারো বছর আগের সেই পুতুল নেই। এখন তার মুখে যেন কথাই আটকায় না। শুধু আটকায় না নয়, বেশ সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে পারে। পাঁচুর বেশ লাগে। সেই চার বৎসরের পুতুল এখন আর ফ্রক পরে না—শাড়ী পরে। যৌবনের সৌন্দর্য তার অঙ্গে ফুটে উঠেছে। লজ্জায় তার মুখখানি সুন্দর, আর তার স্নেহ যেন বটের ছায়ার মমতার মতো ঘিরে রেখেছে তার সমস্ত মনটাকে। কিন্তু ষোল বৎসরের পুতুল পাঁচুর কাছে সেই চার বৎসরের পুতুলই রয়ে গেছে। পাঁচু তার সমস্ত অবসর সময়টুকু ভরিয়ে তোলে কখনো মজার গল্পে, কখনো চাষ বাসের কথায়, কখনো গাঁয়ের কার কি হোল—তার ছোটখাটো টুকি টাকি কথায়।

রমা কিন্তু এটা পছন্দ করে না যে, বাপ বাড়ী ফিরলেই পুতুল হাতে শত কাজ থাকলেও তাঁর কাছে উপুর হয়ে পড়ে। তাই সে বাচাল, বেয়াদব, আরো অনেক কিছু।

পুতুলের একটা স্বভাব ছিল, সেটা ভাল কি মন্দ বুঝি না। পাঁচু বাড়ী না থাকলে তাকে প্রায়ই দেখা যেত, কোন না কোন এক গাছের তলায় তার

সখা সখীদের নিয়ে সে কিসের যেন একটা বেশ জটলা পাকিয়ে চলেছে। এই এর সঙ্গে আড়ি, এই ওর সঙ্গে ভাব। এই তার লেগেই রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, কোন দিনও পাঁচুর পাতানো খুড়ো বিশ্বনাথের ছেলে শঙ্করের সঙ্গে পুতুলের মতের অমিল হয় না। পুতুলের শঙ্করকে খুব ভাল লাগে।

আজকের নবান্নের জন্যে পাঁচু গতকাল খেত থেকে কিছুটা ধান এনেছিল। আজ সেই উৎসব বাড়ী লোকে লোকারণ্য। চারিদিকে হৈ চৈ। পার্বণ পূজো শেষ হ'লে হবে কি, আজ এই আনন্দের রেশ চলবে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত। রাত্রি আজ আনন্দের নেশায় মাতাল। পাঁচুর পূজার পালা শেষ হলেই দু' আঁটি ধান সংলগ্ন খড় কেলে আর ভোলের মুখে এনে ধরে। পাঁচু আজ পর্য্যন্ত যতবার নতুন ধানের পূজা করেছে, প্রতিবারই সে তার নতুন ধান কেলে ভোলেকে দিতে ভোলে নি। শুধু দেওয়া নয়, নিজের ব্যবহারের আগে দেওয়া চাই। তারপর সে এক লক্ষীর চুপড়ী নতুন ধানে পরিপূর্ণ করে তার মেয়ে পুতুলকে এনে দেয়। ঠিক বোঝা যায় না, তার এই দেওয়ার শেষে সে মনে মনে তার মা কুমারী পুতুলের উদ্দেশ্যে এক ভক্তি পূর্ণ প্রণাম নিবেদন করে কিনা।

এ দু'টো কাজে পাঁচুর কোনবারই ভুল হয় না। না হওয়ার একটা কারণ আছে। সে একটা ইতিহাস। প্রথমটার ইতিহাস কি যেন একটা শুনেছি; ঠিক জানিনা; হয়ত পুরুষানুক্রমিক এই নিবেদন একটা মঙ্গল প্রথায় দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রথাটির প্রচলন পাঁচুর নিজের।

* * *

সে বছর দেশে ভীষণ একটা অজন্মা হয়েছিল। অনেককেই বীজের ধানে জীবন ধারণ করতে হয়েছিল। পাঁচুকেও। চারিদিকে চাষীদের মধ্যে একটা দুর্ভিক্ষের আর্ত্তনাদ। কিন্তু দু' একটি চাষীপরিবারের চরম বিপদ হ'লেও আর সকলে কোন রকমে নিজেদের সামলে নিয়েছিল। ঠিক চারিদিকের সেই হাহাকার ও আর্ত্তনাদের মধ্যে পুতুলের জন্ম। সেই ভীষণ বিপদেও এই নবজাত শিশুটি পাঁচু আর রমার মুখে একটা আনন্দের হাসি ফুটিয়ে তুলছিল।

জানি না কেন, এই নবজাত শিশুর জন্মের দিন দশ বাদে একটা ভীষণ বর্ষা নেমে এল, হয়ত এর একটা কিছু ইংগিত আছে—কিন্তু সেটা কিসের? জানি না, পাঁচু যে মাঝে মাঝে পুতুলকে অন্নদা বলে ডাকত, সে কেন, কি উদ্দেশ্যে।

* * *

দু' বছর পরে।

পাঁচুর গোলা আর আজকাল লক্ষ্মী শূন্য হয় না। সেই কেলে আর ভোলে আজো তার হালে যোগান দিয়ে আসছে। সংসারে সুখের যে কটা অঙ্গ, পাঁচুর সব কটাই ছিল। তবে একটা চিন্তা মাঝে মাঝে তাকে চিন্তিত করলেও সে এবিষয়ে একেবারে উদাসীন। পুতুলের বিয়ে। পুতুলের মা প্রায়ই এটা ওটা না থাকার কৈফিয়ৎ নিয়ে আসে। আসবে বৈকি, নইলে গৃহিনী কিসের।

কিছু দিন আগে কথায় কথায় বিশ্বনাথ পাঁচুকে বলেছিল, শুনছ খুড়ো, আমাদের কি মন্দ কালই না পড়ল, গাঁয়ে নাকি যন্তর সভ্যতা আসছে।

বিশ্বনাথ ব্যাপারটা কি, ভাল ভাবে জানত না। উড়ো খবর লোকের মুখে যা যতখানি শুনেছিল সবটুকুই পাঁচুকে বলে দিয়ে নিজেকে কিছুটা হাল্কা করে নিল।

যন্ত্র সভ্যতা কি, পাঁচু জানে না, বোঝেও না বটে। বিশ্বনাথও। তবে তাদের শুধু তাদের নয় সমস্ত চাষীর মুখে এই এক কথা—গাঁয়ে আবার যন্তর-তন্তর আসবে কেনে, এতো শহর লয় বাপু—মঙ্গল নিশ্চয় হবে না, খুড়ো—মঙ্গল নিশ্চয় হবে না।

সেদিন পাঁচু তার ক্ষেতে লাঙল দেওয়ার পর সেদিনের মত মই দেওয়া শেষ করে ক্ষেতের একপাশে বসে জিরোচ্ছিল। সর্বাঙ্গ বেয়ে তার গায়ের ঘাম মাটিতে ঝরে পড়ছিল। ঠিক অদূরে দাঁড়িয়ে কেলে আর ভোলে এক মুখ ফেনা নিয়ে ধুক ছিল। পাঁচু আনমনে কপালের ঘাম মাঝে মাঝে ঝেড়ে ফেলছে আর হাতের সামনে যে কটা বড় বড় মাটির ঢেলা পাচ্ছে সে কটাকে হাতের আঙুলের চাপে গুড়া করে চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে সে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে চোখ তুলে দেখল, খাকী প্যান্ট, সাদা শার্ট ও সোলার টুপি পরা কতকগুলো লোক তিন পায়ে দাঁড় করানো ছোট্টো কিসের একটা যন্ত্রের ভিতর দিয়ে কি যেন দেখছে।

বেলা যত গড়াতে লাগল পাঁচুর মনে কিসের যেন একটা চিন্তা ততই পীড়া দিতে লাগল। কাজে আর সে হাত দিতে পারল না। শেষ পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে তাদের সেই অচেনা যন্ত্রটির কাছে গিয়ে এক মনে চেয়ে রইল।

তাদের মধ্যে একজন পাঁচুকে জিজ্ঞেস করল—কি হে ভাই, এই খানেই কোথাও বুঝি কাজ করছিলে ; তোমার ক্ষেত কোনটি ?

পাঁচু একটু নীচু স্বরে বলল—আজ্ঞে, হাঁ বাবু উই আমার ক্ষেত।

তারপর তারা আবার নিজেদের কাজে মন দিল। এর কিছুক্ষণ পর পাঁচু কিছুটা

সাহস সঞ্চয় করে তাদের জিজ্ঞেস করল—আজ্ঞে হাঁ গো বাবু, বলি আপনেরা এই যন্তরটির দিয়ে কি দেখছেন ?

তাদের মধ্যে একজন পাঁচুকে সব কিছুই বুঝিয়ে বললেন। কিন্তু মূর্খ চাষী সব বুঝবে কেন। পাঁচু শুধু এইটুকু বুঝল যে, তাদের গাঁয়ে বছর খানিকের মধ্যে কতকগুলো কি যেন যন্তর (যে যন্ত্রের নাম সে মনে রাখতে পারে নি) আসবে। আর মনে ছিল যে, সে যন্তর দিয়ে নাকি অনেক খানি খেত লাঙলের চেয়ে অনেক অল্প সময় চাষ করা যাবে। শুধু একজন লোকের দরকার ; লাঙল বলদের কোন প্রয়োজন নেই। আর কতকগুলো কথা যে কথাগুলো সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। সে কথাগুলো যতবার তার মনে আসছিল ততবারই ভীতির শিহরণে গায়ের সমস্ত লোমকূপগুলো একেবারে খাড়া হয়ে উঠছিল।—চাষীদের নাকি অনেককেই গাঁ ছেড়ে শহরের কলখারখানায় দিন মজুরি করতে যেতে হবে।

পাঁচু বাড়ী এসে একেবারে হাত পা ছেড়ে মেঝের ওপর শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর পুতুল এসে জিজ্ঞেস করল—বাবা, তোমার কি হয়েছে ?

পাঁচু একটু চোখ মেলে বলল—কিছু হয়নি তো, মা।

তারপর যত দিন যায়, পাঁচু ক্ষেতে যায়, ফিরে আসে। বাড়ীতে বড় একটা কথা বলে না। প্রায় সময়ই চুপ করে শুয়ে থাকে, আর ভাবে, পুতুল আর রমাকে বলে ফেলে, কিন্তু পারে না।

কিছু দিন পরের কথা। একদিন অনেক রাত্রে পাঁচু হঠাৎ ঘুমের মধ্যে কি যেন কি ভেবে একটা অস্পষ্ট চীৎকার করে কেলে আর ভোলের কাছে ছুটে এসে এক হাতে তাদের গলার দড়ির খুঁট ধরে, আর এক হাতে লাঙলটা বুকে চেপে ধরে সেইখানে বসে পড়ল।

রমা আর পুতুল ভয়ে চীৎকার করতে করতে ছুটে এসে পাঁচুর কাছে দাঁড়াল। রমা হাঁপাতে হাঁপাতে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল—ওগো, তোমার কি হোল—বল, বল তাড়াতাড়ি বল ?

পাঁচু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—দেখ, ওই কারা আসছিল আমার কেলে ভোলেকে নিয়ে যেতে।

রমা আরো ভয়ে জিজ্ঞেস করল—কারা ?

পাঁচু এবার সব কথা খুলে বলল।

এরপরও অনেক দিন রাতে স্বপ্ন দেখে চীৎকার ক'রে পাঁচু, কেলে আর ভোলের কাছে ছুটে চলে এসেছে।

* * *

প্রায় এক বছর পর।

গাঁয়ে আর কেউ লাঙল বলদে চাষ করে না। ট্রাক্টারে চাষ শুরু হয়েছে। চাষীরা তো অবাক। কেবল চেয়ে দেখে, ট্রাক্টারের পেছনে লাঙলের ফলার মত যে লোহাগুলো আছে সে গুলো কেমন করে একবারে অতখানি মাটি গর্ত্ত করে কেটে, চৌচির করে অত তাড়াতাড়ি চলে যায়।

এই সেদিন পর্য্যন্ত পাঁচু তার কেলে আর ভোলেকে দিয়ে চাষ করেছে। সরকারের লোক পাঁচুর ক্ষেতটা সব শেষে অধিকার করে। কারণ, সেটা—আয়তনে বড় ছোট, আর রয়েছে এক বিশ্রী রকমের কোণে। এরি মধ্যে গাঁয়ের অনেককে শহরের কলে কাজ নিয়ে চলে যেতে হয়েছে। তবে অল্প সংখ্যক যারা রয়ে গেছে, তারা ওই নবাগত সরকারের লোকদের কাজে সাহায্য করে; মাসান্তে মাইনে পায়।

পাঁচুর পাতানো খুড়ো বিশ্বনাথ তাদেরই মধ্যে একজন। পাঁচু অনেক চেষ্টা করেও বিশ্বনাথের মত একটা কাজ জোগার করতে পারল না।

একদিন পাঁচু দুঃখ করে বিশ্বনাথকে বলছিল—খুড়ো, তোমার ভাগ্য তবুও ভাল—নিজের হাতে মাটি চাষ করার আনন্দ ওরা তোমার কেড়ে নিলেও গাঁ তো তোমার ছাড়তে হ'ল না।

পুতুল তখন পাঁচুর পাশেই ছিল—তাদের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল —আচ্ছা, বিশুকাকা, শঙ্কর কী এখানেই থাকবে?

কিন্তু বিশ্বনাথের তখন পাঁচুর কথাগুলো শুনে চোখে জল এসে গেছে। কম্পমান ঠোঁট দু'টো দাঁত দিয়ে চেপে সে আস্তে আস্তে মাথা নীচু করে ফেলল; কোন উত্তর দিতে পারল না।

এই, এইমাত্র সরকারের লোক কেলে ভোলেকে নিয়ে গেল; পাঁচুকে তার পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আজ পাঁচু নির্বাক। চোখ দিয়ে শুধু তার অনবরত জল ঝরে পড়ছে। অনেকক্ষণ কেলে আর ভোলের চলে যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে চেয়ে সে চোখের জল মুছতে আরম্ভ করল। তারপর তার বুকের পাঁজর ভেঙে একটা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এল; তার আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে শোনাগেল একটা অস্পষ্ট ক্রন্দন ধ্বনি; আর সেই সঙ্গে

কেলে ভোলে পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল। কিন্তু এখনও দূরে শোনা যাচ্ছে ফিরে আসার জন্য কেলে ভোলের অসহায় আর্তি ও বেদনাপূর্ণ ডাক।

পাঁচু আসছে কাল শহরের পথ ধরবে ঠিক করেছিল, কিন্তু তার এই গাঁ যেখানে অতীতের কত হাসি, কত কান্না, কত সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনার স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে, সে গাঁ আজ তার কাছে বিষাদে পরিপূর্ণ। কেলে ভোলের সেই খুঁটি দু'টোয় আজ তাদের গলার দড়ি জড়ানো না থাকায় শ্রীহীন। আজ তার এই গাঁয়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকার এতটুকু স্থান, এতটুকু সময় নেই।

রমা আর পুতুল পথে বেড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে গেছে। পাঁচু তার সেই লাঙলটা কাঁধে করে আস্তে আস্তে এগুতে শুরু করল। বিশ্বনাথ আর শঙ্কর তারি সঙ্গে মাথা নীচু করে আসছিল। পাঁচু শঙ্করের মাথায় হাত দিয়ে বলল—'আর এসো না ভাই, যত আসবে ততই আসতে ইচ্ছে করবে।'

তারপর তারা তিনজন আস্তে আস্তে পথের সেই বাঁকের কাছে এসে পৌছল। পুতুল একবার শঙ্করের দিকে শেষ বারের মত চেয়ে পাঁচুকে জিজ্ঞেস করল—"বাবা, শঙ্কর যদি আমাদের সঙ্গে আসে, শহরের একটা কারখানায় কাজ পাবে না?" তারপর তারা মিলিয়ে গেল পথের বাঁকে।

পথ চেয়ে চলতে চলতে পাঁচু তার খেতের আল্ পথের ওপর এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার পা আর চলতে চাইল না; সে বসে পড়ল। রমা ওদিক থেকে জিজ্ঞেস করল,—বসলে কেন?

পাঁচু আস্তে আস্তে বলল—তোমরা চল, আমি এই আসছি।

পাঁচু তার খেতের ওপর একেবারে পা ছড়িয়ে বসে এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে নাকের কাছে এনে মাটির গন্ধে নাক ভরে নিল।

দু'হাতের মাটির ওপর চোখ রেখে বার বার তার মনে হতে লাগল—এই সেই মাটি, এই সেই কালো ধূসর মাটি, যে মাটিতে তার বাপ ঠাকুরদা হাল দিয়েছে, যে মাটিতে শুয়ে এই আকাশের দিকে চেয়ে তারা তাদের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে গেছে, যে মাটিতে তাদের ভিটে, যে মাটিতে সেও ছেলেবেলায় বাপ-ঠাকুরদার মত হাল দেওয়া শিখেছে—সে মাটি আজ আর তার নয়—তাকে দাঁড়াতেও দেবে না এতটুকু সময়। আস্তে আস্তে তার চোখ দু'টো জলে ঝাপসা হয়ে এলো। দু'ফোঁটা জল তার সেই হাতের মাটির ওপর পড়ল। কালো মাটি আরো কালো হ'ল—মাটি যেন তাকে টানে। তারপর হাতের মাটিটুকু সে একবার তার গায়ের

জোরে হাতের মুঠোয় চেপে আঁকড়ে ধরল। এ-মাটিটুকু সে ছেড়ে দেবে না, এ মাটিটুকু সে তার গায়ের রক্তের সঙ্গে মেখে নেবে। এতদিন সে যাকে বোঝেনি আজ তাকে বুঝেছে—বুঝেছে—এ মাটি তার নিজের, কত কাছের, কত আপনার – যেন এর সাথে তার রক্তের সম্বন্ধ।

তারপর কাপড়ের একখুঁটে আস্তে লুকিয়ে সে তার হাতের মাটিটুকু বেঁধে নিল। এ-মাটিটুকু সে নিয়ে যাবে। কিন্তু লুকিয়ে কেন? মাটি চুরি করছে—এ তার মনে হ'ল কেন—এতো তার নিজের মাটি?

একবার ভাবল লাঙলটাকে নিয়ে গিয়ে আর কি হবে, এইখানে তার ক্ষেতেই রেখে যায়, কিন্তু পারল না। আবার কাঁধে তুলে নিল। তুলে নিয়েই একেবারে এক নিশ্বাসে কিছুটা এগিয়ে গেল।

পুতুল কিন্তু তখনও পিছন দিকে ফিরে কাকে যেন বার বার চেয়ে দেখছিল। পাঁচু সেই হন্ হনিয়ে এগুতে এগুতেই রুক্ষ স্বরে বলল—"হতভাগী মেয়ে, চেয়ে দেখছিস কি অত?"

পুতুলকে যে সে সব কথায় 'মা' বলে ডাকত আজ আর তার সে কথা মনে নেই।

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান্!

—রবীন্দ্রনাথ

ঢেউ

দীপক চাকলাদার

চতুর্থ বর্ষ। বিজ্ঞান

অন্ধকার শুধুই অন্ধকার। চারিদিকে কিছুই দেখা যায় না। কেবল বংগোপসাগরের উত্তাল ঢেউ একের পর এক চলে যাচ্ছে বহুদূরে—কোথায় তার শেষ, কে জানে! তার মাঝে হেলে দুলে চলেছে এক জাহাজ। জাহাজের সন্ধানী আলো সেই জমাট বাঁধা অন্ধকারের বুক চিরে চলে গেছে অনেক দূর। .....

জাহাজের ডেকের এক অন্ধকার কোণে আশ্রয় নিয়েছে একটি পরিবার। পূর্ব-বংগের ছিন্নমূল বাস্তহারা। নূতন নীড়ের স্বপ্নে ভেসে চলেছে অজানার উদ্দেশ্যে। একটি শিশু তার মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। বাবা তার পাশেই ঘুমিয়ে পড়েছে। শিশুটির চোখে ঘুম নেই। সে মায়ের গালটা একটা আঙুলে টিপে জিজ্ঞাসা করছে, "আচ্ছা মা, আমাদের দেশের মাষ্টারমশাই বলেছিলেন, এই বাংলাদেশ আমাদের সকলের মা। তবে কেন আমরা সেই দেশ ছেড়ে অন্যদেশে চলেছি ভাল ঘর পাবার আশায়? আমার কিন্তু মনে হয় না, তোমাকে ছেড়ে আমি একদণ্ডও থাকতে পারব না।..... আচ্ছা মা, আমাদের সে ছাগলছানাটা এখন কত বড় হয়েছে? ফজলুলরা ওকে ঠিক দেখবে তো? যদি ওকে শেয়ালে নিয়ে যায়?"

শিশুর অনবরত প্রশ্নে বিব্রত হয়ে মা বলেন, "আঃ রুনু, এখন চুপ করে একটু ঘুমাও।"

মায়ের কথায় রুনু চোখ বন্ধ করে, কিন্তু মনে মনে নানা কথা চিন্তা করে যায়। কত কথা তার মনে পড়ে। ফজলুল তার ছোটবেলার বন্ধু আর সহপাঠী। পাঠশালায় পাশাপাশি বসত দু'জনে। গুরুমশায়ের দু'জনেই ছিল প্রিয়পাত্র। আর শুধু পাঠশালায় কেন, মাঠে-ঘাটে, নদীর পারে সব সময় একই সংগে তারা ঘুরে বেড়াত। লোকে ঠাট্টা করে বলতো—'মাণিকজোড়'।

এমনি সময় একবার পরীক্ষায় ফজলুল হঠাৎ খারাপ করে ফেললো। অবশ্য সেটা তার হঠাৎ অসুখের জন্যই হয়েছিল। ফজলুলের দুঃখে রুনুর চোখও ভিজে উঠেছিল। পরে অবশ্য ফজলুলকে দিয়েছিল তাদের কাঁচামিঠে গাছের আম—ভুলিয়েছিল তাকে নানাভাবে। আর একবার রুনুর অসুখ হয়েছিল। মারাত্মক রোগ। গাঁয়ের

বড় ডাক্তার পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তখন ফজ্‌লুল এসে বসতো তার মাথার কাছে। কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বলতো, 'ভয় নাইরে, ভাইজান। তুই ভাল হয়ে উঠলেই আমরা আবার যাব আমবাগানে, যাব নদীর ধারে ছিপ নিয়ে।" এমনি কত কথাই সে বলতো। বন্ধুর প্রীতির স্পর্শ নিয়ে ভাল হয়ে উঠেছিল রুণু। তারপর আবার চলেছিল যথারীতি আনন্দময় জীবন।

কিন্তু হঠাৎ একদিন কি হোল। গাঁয়ের মাঠে সভা বসলো। পতাকা উড়ল। ফজ্‌লুল বলে, সেদিন নাকি দেশ স্বাধীন হয়েছে। তবে সভায় বাবা গেল না কেন! এদেশ তো বাবারও। বাবা বলেন যে, এই স্বাধীনতা নাকি হিন্দুদের জন্য নয়, শুধু মুসলমানদের জন্যই। কথাটা ঠিক রুণু বোঝে না। ফজ্‌লুল আর তার দু'জনেরই তো এই দেশ। তবে যে স্বাধীনতা ফজ্‌লুলের, সেটা কেন রুণুর হবে না। ফজ্‌লুলকেও রুণু ঠিক এই প্রশ্নই করেছিল পেয়ারা গাছে বসে। পেয়ারা চিবুতে চিবুতে ফজ্‌লুল বলেছিল, "ভাইজান, স্বাধীনতা কার হোল তা নিয়ে আমাদের কি হবে? আমাদের ভাবটা ঠিক থাকলেই তো হ'ল!"

কালের স্রোত বয়ে চলেছে ধীরে, ধীরে দিনে দিনে।···দেশের লোকের হাব-ভাব, চালচলনের পরিবর্তন রুনু দেখতে পায়। সে লক্ষ্য করে, মুসলমানদের গতি বিধি। তারা যেন আজকাল নতুন মানুষ হয়ে উঠেছে। হিন্দুদের মনে কেমন যেন ভয়-ভয় ভাব। হিন্দু-মুসলমানদের সে সম্প্রীতি যেন আর নেই। বাবা বলেন, সে যেন আর ফজ্‌লুলদের পাড়ার ছেলেদের সংগে বেশী মেলামেশা না করে। ফজ্‌লুলের বাবাও হয়তো ফজ্‌লুলকে ঠিক একই কথা বলেছিলেন। ফজ্‌লুলের সংগে ঘনিষ্ঠতা তাই ক্রমশঃ কমে আসতে লাগল। পাঠশালা ছাড়া আর তাদের আর বড় একটা দেখা শোনা হয়না। রুনুর এসব কিছুই ভালো লাগে না।

একদিন মসজিদ বাড়ীর মাঠে এক সভা বসল। সেদিন রুণুর বাবা হঠাৎ তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরেই সব গোছ গাছ করতে থাকেন। অতি প্রয়োজনীয় জিনিষগুলোই কয়েকটা পুঁটুলি করে বেঁধে নেওয়া হয়। দিনটা যেন কেমন থমথমে ভাবে কাটে। রুণু দু'চারবার কর্মব্যস্ত বাবা এবং মায়ের সান্নিধ্যে আসবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাঁদের গম্ভীর মুখ লক্ষ্য করে কিছু বলবার সাহস পায়নি। তারপর সন্ধ্যার সময় মসজিদ বাড়ীর সভা যখন পুরোদমে চলেছে—তখন ফজ্‌লুলের বাবা এসে হাজির রুণুদের বাড়ীতে। রুনুর বাবার সংগে তার কি গোপন কথা হ'ল। তারপরই মোটঘাট নিয়ে গৃহদেবতাকে প্রণাম করে ফজ্‌লুলের বাবার সংগে তারা বেড়িয়ে

পড়ল। রুণুও একফাঁকে ছোট্ট ছাগলছানাটিকে কোলে করে নিয়ে বেড়িয়ে পড়ল। কোথায় চলেছে রুণু তা জানে না। বকুনি খাবার ভয়ে সে কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও পারে নি। সে শুধু নিঃশব্দে পিছনে পিছনে চলে। হঠাৎ ছাগলছানাটি ডেকে ওঠায় বাবার নজর পড়ে বাচ্চাটির দিকে।

তিনি ধমকে উঠলেন, "মানুষ খেতে পারে না, আবার ছাগল!" রুণুর বড় আদরের ছাগলছানা, তাই সে কেঁদে উঠে বলে, "শেয়ালে যদি···।" কথাটা আর শেষ হয় না। নদীর ধারে গিয়ে দেখে ফজ্‌লুল দাঁড়িয়ে আছে। ঘাটে বাঁধা ফজ্‌লুলের বাবার নৌকা। রুণু ফজ্‌লুলকে ছাগলছানাটা দিয়ে কেঁদে ফেলে বলে, "ফজ্‌লুল ভাই চললাম। আবার আসব। তুই ভাই একে দেখিস। কান্নাতে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। ফজ্‌লুলের চোখও বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসে; কান্নার আবেগে সে নিজেকে দমন করে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

রুণুর বাবা মা ততক্ষণ নৌকায় গিয়ে বসেছেন। ফজ্‌লুলের বাবা ধরেছেন হাল। রুণুও আস্তে আস্তে নৌকোয় উঠে পড়ে। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হয়। নৌকা এগিয়ে চলে দুলতে দুলতে। ধীরে ধীরে গ্রামের রেখা ক্ষীণ হয়ে আসে। রুণু তাকিয়ে থাকে একই দিকে, একই দৃষ্টিতে। আর দূরে নদীর উতল হাওয়ায় বালি উড়ে যাচ্ছে। তার ওপর বিদায়ী সূর্যের আলো পড়ে এক করুণ গোধূলির সৃষ্টি হয়েছে। সেই প্রশান্ত নদীতীরে ধূসর সন্ধ্যায় দুহাতে ছাগশিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ফজ্‌লুল দাঁড়িয়ে আছে; চোখের জলে তার বুক ভেসে যাচ্ছে। এই অশ্রুজল বেদনাবিধুর নীরব ভাষায় রুণুকে বিদায় জানিয়ে গেল।

ভস্ ভস্ শব্দ করে জাহাজটা এগিয়ে যাচ্ছে বংগোপসাগরের ঢেউয়ের উপর দিয়ে দিগন্তের দিকে। তারই ডেকের উপর একটি শিশু তার মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠে। চোখ দিয়ে তার গড়িয়ে পড়ে মুক্তার মত দু'ফোঁটা অশ্রুজল।

কবিতা

সমুৎসুক

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রাক্তন ছাত্র

দক্ষিণেও সূর্য হেলে,
তারপর আবার উত্তরে।
সমুৎসুক মানবাত্মা
চেয়ে আছে সেই শুভক্ষণ।

এ হিমেল গ্লানি হ'তে
নভোনাভি বিচলিত ক'রে
কবে হ'বে সে উত্তরায়ণ।

রূপনারায়ণের তীরে

দিনেশ দাস
প্রাক্তন ছাত্র

কী রূপ দেখালে তুমি রূপনারায়ণ!
তোমার বুকের 'পরে
ছোট ঢেউ ভেঙে পড়ে
হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে শিশুর মতন—
অপরূপ রূপনারায়ণ!

ছবি-ছবি গ্রাম—
তার মাঝে জেগে ওঠে তাম্রলিপ্ত নাম,
কবেকার হারানো বন্দর
সব কিছু মুছে দিয়ে ছল্‌ছল্‌ তর্‌তর্‌
ভাসে শুধু তোমার আশ্চর্য গান
সারা দিনমান :
হঠাৎ রাত্তিরে শুনি মাটির বুকের নীচে
চাপা মহাসমুদ্রের ডাক—
হয়েছি অবাক্‌।

অলাতচক্র

বিরাম মুখোপাধ্যায়

প্রাক্তন ছাত্র

ধমনীর তৃষ্ণা শেষ।
চক্রবালে শান্ত ইন্দ্রধনু—
বর্বর পৌরুষ হ'তে অরাজক অগ্নির বিচ্ছেদ ;
জানিলাম এই শান্তি।
এই শান্তি অগাধ, অপার—
আর
জীবন মসৃণ ; পলে-পলে
আত্মিক স্বাস্থ্যের কান্তি,
সভ্যতার প্রবুদ্ধ প্রগতি।
জানিলাম এই শান্তি অগাধ, অপার।

তারপর ইতিহাসে বর্ণচোরা দিন।
সময়ের ধুলো লেগে শুভ্র শান্তি কুটিল, কঠিন।
তারপর
সূক্ষ্মস্বার্থ বজ্রমুষ্টি তোলে ;
ছদ্মবেশী রক্তসন্ধ্যা দোলে
জাদুবুদ্ধি বিজ্ঞানীর নখর-বিদ্যুতে।
বন্দরের কৃষ্ণমেঘ
সুস্থচিত্তে হানা দেয়,
রক্তে তৃষ্ণা আনে।

সভ্য চিত্তে তবু শান্তি চাই
—সৌম্য শান্তি, শুভ্র, অব্যাহত।
কণ্টকিত দুরাশার নগ্ন রোমন্থন
আর নয়;
আর নয় অর্থনীতি জীবন্মৃত তন্দ্রার ব্যঞ্জনা।
বন্দরের কালো মেঘে উদ্ধত ইঙ্গিত—
ইস্পাত ও বারুদের জ্বলন্ত ফলক
সমাধান-উদ্যত, চঞ্চল।
ইতিহাসে রক্ত-ঝরা দিন,—
সভ্য চিত্তে তবু শান্তি চাই
—সৌম্য শান্তি, শুভ্র, অব্যাহত।

জীবনের স্বাদ আজ রক্ত-ঝরা দিনে।
ইতিহাস পরিপাক করে
সভ্যতার মানচিত্রে করুণ আগুন,
অনিবার্য নগ্ন অগ্নিবাণ।
ক্লান্ত হাঁটু তাই সিঁড়ি ভাঙে;
বার-বার মাথা ঠুকে যায়
সর্বনাশা রহস্যের দুর্ভেদ্য দেয়ালে।
তাই জীর্ণ সাম্য-মৈত্রী-সমাধির 'পরে
খরশান্ শান্তির স্বস্তিক,
—সুধাস্বাদ বিষ-বিভীষিকা!

এ এক নতুন স্বাদ,— অন্য কোনো জীবনের অচির সুষমা,
অন্য এক পরিতৃপ্তি মৃগতৃষ্ণিকার,
আয়ুর মাধুরী।

এই তো পরম শান্তি
ভস্মতলে দাবাগ্নির ঘুম,
নির্বিকার আত্মতুষ্টি ইতর উৎকোচে।
অন্য এক জীবনের এই শান্তি তবু অব্যাহত,
হৃদয়ে হীরক জ্বলে
সভ্যতার রক্ত-ঝরা দিনে॥

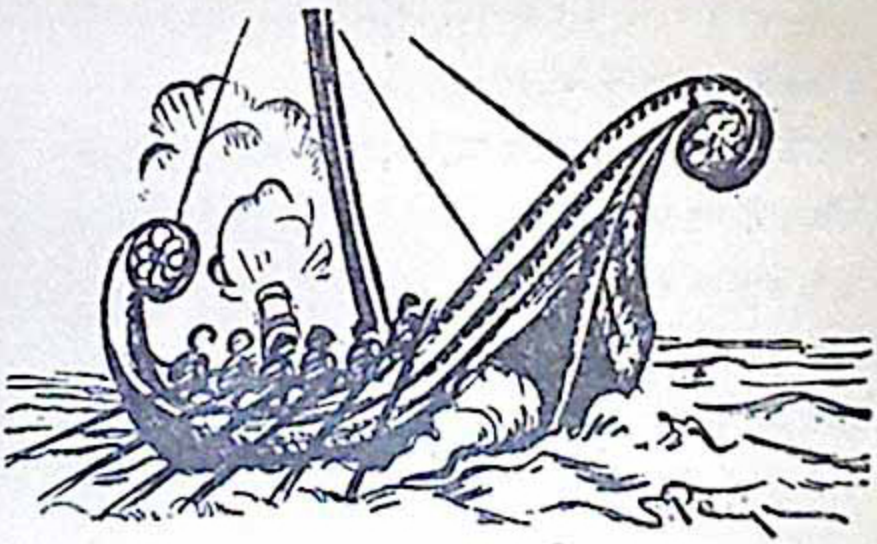

কী একটা সুর

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাক্তন ছাত্র

কী একটা সুর গুনগুনিয়ে বাজছে আমার মনে,—
মেঘভিজে রোদ যেই ছড়ালো মাঠের কোণে কোণে!
আকাশ বাতাস আকুল করা মনটানা সঙ্গীতে
হারিয়ে যাওয়া ঢেউগুলি হায় বেদন হানে চিতে।
দিন কেটেছে রাত কেটেছে ঝরাপাতার মত,—
আজ বারোয়াঁর বাঁশীর সুরে দিগন্ত বিক্ষত!

কী একটা সুর গুনগুনিয়ে বাজছে আমার মনে,—
যা' কিছু তা'র কথার মায়া লুকায় সুগোপনে।
ব্যথার হাসির কুসুমগুলি অশ্রুমতী মেঘে
নীলমাতানো আকাশে হায় উঠছে কেবল জেগে।
দিন কেটেছে রাত কেটেছে ঝরাফুলের মত:
সেই স্বপনের সৌরভে আজ মন মম সন্নত!

কী একটা সুর গুনগুনিয়ে বাজছে আমার মনে,—
মেঘভিজে রোদ যেই লুটালো কান্তারে প্রাঙ্গনে!
উড়াল পাখির ডানায় ঝরে বিষণ্ণ যে হাসি
তা'র ঝলকে অশ্রু আমার উঠছে পরকাশি।
শুধাই তোমায়, ওগো আকাশ, তোমার বুকের তলে
কোন প্রণয়ীর গানের বেদন অন্তবিহীন জলে?

এই জন্মে

উৎপলকুমার বসু

চতুর্থ বর্ষ। বিজ্ঞান

গাছের ছায়া কাঁপলো সই, পদ্মদীঘি জলে।
ঘূর্ণি হাওয়া বনের তলে তলে
শুকনো পাতা নাচায়—
সই, ফিরলে তারে বোলো
রূপের পাখি বাঁধে না কেউ লোহার কালো খাঁচায়।

পলাশডালে রইলো মেলা আগুন-রাঙা শাড়ি :
ফিরলে তারে বোলো,
এ তো বহুদিনের পাড়ি।

গাছের ছায়া কাঁপে না, সই,
চোখের আলো কাঁপে।

স্বর্গদ্বার থেকে পুরীর সমুদ্র

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

চতুর্থ বর্ষ। বিজ্ঞান

মুখর জলের ভাষা সুর হ'য়ে বেলাভূমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
সারাদিন, সারারাত, অতৃপ্ত আশ্লেষে ছেয়ে
ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে ; রেখে যায় উষর বালুর গেরুয়ায়
ঝিনুকের সাদা হাড়, কুচিফেনা, কখনো বা শুভ্রকায়া নিয়ে
প্রশান্ত শঙ্খশিশু, বুকে যার পুঞ্জীভূত সমুদ্রেরই সুর,
সায়ন্তনী গন্ধধূপে দেবালয়ে সুপ্তি ভাঙ্গে তার।

নীলাভ সচল জলে দৃষ্টি পেতে আরো কিছুদূর
ঢেউ-এর স্বগত শিল্পে প্রথাদ্রুত গতির বিস্তার,
দুগ্ধশ্বেত পাড় বুনে, সাঙ্গ করে হাতবদলের পালা
উপহার দিয়ে যায় প্রতিবেশী স্থবির মাটিরে,
তারপর ফিরে চলে যৌবনের দীপ্ত অহঙ্কারে।

সঞ্চারী সন্ধ্যায় তীরে, ধীরে কমে মানুষের সাড়া,
সমুদ্র সরোদে বাজে বেহাগের উদাস কথারা :
অবশেষে সেও চলে যায়, ছন্দোবদ্ধ পদপাত ফেলে
সাথী সাথে ছোটো ছুটো ভাই, বালির ভাস্কর্য্যে যারা
এতক্ষণ ব্যস্ত ছিল। তার অবিন্যস্ত কালোচুলে
আর শাড়ির আঁচলে ছিল জলদস্যু বাতাসের অবুঝ বিস্তার ;
শুধু সিক্ততটে আঁকা থাকে ফেরারী সে স্মৃতির বিলাপ।
সাগরে জোয়ার আসে, উচ্ছলিত স্নিগ্ধ শুশ্রূষায়
মুছে যায় প্রণয়ী তটের বুকে বিদেশিনী পায়ের উত্তাপ।

রাত নামে। নক্ষত্রের মানচিত্র দূরের আকাশে
মুগ্ধছবি তুলে ধরে আলোশীর্ষ তরঙ্গের পাশে।
শুধু চেয়ে থাকা ;—হোটেলের বাতায়ন খুলে
পৃথিবীকে অনুভব সাগরের সুবহ কল্লোলে।
ধীরে ধীরে আঁখিপক্ষ ঘন হয়, অবশেষে ঘুমে আসে ভরে ;
সেই ঘুম ভাঙ্গে সূর্যোদয়ে। যখন পাখীর ডাকে
শুভ্রশান্ত ভোর ফিরে আসে, আর, আহা আলোর আদরে
আবির রাঙ্গানো মুখে সূর্যবতী হয়ে যায় সাগরের জল।

মনে পড়ে ক'লকাতা, একমুঠো পৃথিবী আমার।
—বালীগঞ্জে আমাদের বাড়ী, মোটে দুটো ঘর : মেঘের আঁচল
এমন প্রশস্ত করে কোনদিন দেখিনিতো আর ;
এমন আপন ক'রে হৃদয়ের ললিত সুবাস
করিনিতো কভু আত্মগত !
একদিন ফিরে যেতে হ'বে তবু
জীবনেরি রিক্ত প্রয়োজনে,
বিষণ্ণ বিকেল আর সারিঘন মানুষের ভীড়ে,
একটি নীলাভ মুখ হারাবে এ মনে।
সায়াহ্নের শঙ্খবাণী যার কথা শোনাবে আমায়
মনে সে তখন নিহত ॥

অনন্যা

রত্নেশ্বর হাজরা

তৃতীয় বর্ষ। সাহিত্য

শরতে আকাশ নীল, সবুজ ঘাসের দিকে চেয়ে—
হঠাৎ সতেজ মন,
হাতের ইসারা দিয়ে বলি :
'এখন তো অবকাশ, তোমারো তো কোন কাজ নেই
(পাখিরাও ছাড়ে আজ নীড়)—
চলোনা দু'জনে মিলে ঘুরে আসি সেতুবন্ধ অথবা কাশ্মীর।'

নরম একটু হেসে অবশেষে
আমার দুচোখ ভ'রে চোখ রেখে বললো সে :
'আজ দেখো ঘরে ঘরে সব বধূ আঁকে আলপনা
শরত-লক্ষ্মীর দিন, তাকে ছেড়ে সেতুবন্ধ চলে যাওয়া
সে কখনো ভালো লাগে ? তুমিই বলো না।'

আবার বছর ঘুরে এলো :
বন্যায় ভেসে গেছে গ্রাম
মড়কে পাণ্ডুর দিন, আকালের ছায়া কালো কালো ;
আমি তাকে ডেকে বললাম :
'আমার অসহ লাগে এ মরণ চেয়ে চেয়ে দেখা,
তার চেয়ে চলো ঘুরে আসি
দুইজনে মিলে একা একা
যেখানে আকাল নেই, শুধু সমারোহ হাসি গান।'

সে শুধু ফেরালো মুখ ;
ক্লান্তির জ্যোছনা ভরা ছলোছলো চোখেতে আবার
বললো সে, 'তোমার নিষ্ঠুর প্রাণ।
দেশ গেলো, ঘর বাড়ী গেলো বন্যায়,
হাজার মানুষ মরে, এমন দেশকে ফেলে রেখে
তুমিই বলোনা, আজ একা একা দূরে যাওয়া যায় ?'

চোখের আলোয়

সত্রাজিৎ দত্ত

চতুর্থ বর্ষ। বিজ্ঞান

আকাশ ছোঁয়া মুহূর্তের সোনার চূড়া গলে
আমার সুখ, আমার ভয় তোমার চোখে জ্বলে।

দু'হাত ভরে আমাকে যেই রাত্রি দাও, আর
যন্ত্রণার তীক্ষ্ণ তূণে দিনের সম্ভার,
তিমির ধু ধু একলা মাঠে উধাও সেই রাত,
হিংস্র ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া দিনের ধারাপাত
ক্লান্তি ঢেউ ভাসিয়ে দেয় স্মৃতির হিম জলে
আকাশ ছোঁয়া মুহূর্তের সোনার চূড়া গলে ॥

হৃদয় জুড়ে শংকাহীন অভীপ্সার ধূপ
নিত্য পোড়ে ; হাওয়ার শ্বাস নিবিড় নিশ্চুপ
অংগীকারে মগ্ন, আর মেঘের কোণে কোণে
দীপ্ত রেখা ছায়ার পটে আলোর পাড় বোনে।
সূর্যসাধ লুকায় মুখ সিক্ত করতলে ;
আমার সুখ, আমার ভয় তোমার চোখে জ্বলে ॥

তোমার চোখ শংখচূড় সমুদ্রের গানে
নিরুদ্দেশ চক্রবাক্, দূরের আহ্বানে
বিদ্ধ হয় আমার ভয় আমার সন্তাপ,
সমর্পিত অঙ্গুলীর শরীরী সংলাপ
আশ্বাসের দুর্গ গড়ে, হাওয়ায় মেঘে জলে ;
আকাশ-ছোঁয়া মুহূর্তের সোনার চূড়া গলে ॥

প্রত্যহের মুখর প্রভা ব্যস্ত সমারোহে
অন্তহীন দিগ্বলয়, অন্য দূর গ্রহে
অভিজ্ঞান আলোর ঢেউ জিজ্ঞাসায় কাঁপে
তোমার চোখে মৌন-মোহে লক্ষ সুরালাপে ;
বিরল ক্ষণ-শাশ্বতীর আপাত সম্বলে
আমার সুখ, আমার ভয় তোমার চোখে জ্বলে ॥

আকাশ ছোঁয়া মুহূর্তের সোনার চূড়া গলে
আমার সুখ, আমার ভয় তোমার চোখে জ্বলে ॥

উপনিষদের পাখি

গুণময় দাস

তৃতীয় বর্ষ। সাহিত্য

একটা গাছের ডালে ব'সে নিরালায়
সেই উপনিষদের দুটো পাখি—
একটা খায়, আর
একটা দেখে।

উপনিষদের সেই সুন্দর পাখি দুটো—
পালকের পরতে পরতে হাজারো রঙের মেলা,
সোনালী বলিষ্ঠ চঞ্চুপুটে অস্ফুট মধুর কলধ্বনি,
চোখের তারায় তাদের
আবেশের বলয় মদিরতা।
ঘনসবুজের অথৈ সমারোহে
মনের আনন্দে একজন খায়,
প্রাণভরে চেয়ে থাকে অন্যজন
দেখার আনন্দে শুধু মেতে॥

আজকের ভোরেও দেখি দুটো পাখি—
একটা খায়, আর
একটা দেখে।
তবে, একটা অনেক উঁচুতে গাছের ডালে বসে,
অন্যটা ডানা-ভেংগে গাছের তলায়॥

কাগজের নৌকা

বিজনকুমার ঘোষ

তৃতীয় বর্ষ। সাহিত্য

কোনদিন যদি হয়—
যদি হয়ে যায় একাকার
গহীন নদীর পাড় ঃ আর ঐ মেঘের কিনার ;—
তবু জানি এ হৃদয়ে পড়বে না কোন এক ছায়া ;
নদীর দেশের নীল—
অতলান্ত সবুজের মায়া
ছড়াবে না।
আলেয়ার আশাভরা বুকে
চলে যাবে জানি আমি। আজ নয় আর কোনদিন
পড়ন্ত আলোয় সব ঋণ
শেষ করে তারপর—মেঘের কিনার বেয়ে বেয়ে
লাল-নীল পালতোলা কাগজের নৌকোতে ছেয়ে
আবার—আবার যদি আসি
তবে আহা, সেই এক পুরাতন খেলা
নতুন নদীর পাড় ঃ ভরা কাশ বনে বনে
ঝলমল শিশিরের বেলা ॥

গ্রামের নামে

শ্রীশ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃতীয় বর্ষ। বিজ্ঞান

এখনো আমার মন সাতক্ষীর গ্রামটি ঘিরে
সোনার স্বপ্ন আনে সহরের শেষ সীমানায়,
বকুল-ছায়ায় পথ শান্তির পরশে ধীরে
শ্রান্ত পথিক-মনে বকুলের গন্ধ ছড়ায়।

সেখানে পড়েছে রোদ নিমতলা মাঠটি ছাড়িয়ে
নতুন ফুলের মতো কিশোরের স্বরেতে মুখর ;
অনেক শীতের দিন সেখানে যে শুনেছি দাঁড়িয়ে
কাজল-দীঘির ঘাটে সে মেয়ের কণ্ঠের স্বর।

সেখানে সূর্য নামে। ইছামতি গাঢ় নীল হলে—
সোনালী-রোদের ঢেউ নীলে সোনা, সোনা-নীল হয়,
ধানের শিষের গোড়া অদৃশ্য শ্রাবণের জলে :
হারানো আমার মন যেন আজ ফের কথা কয়।

দেখেছি দু'চোখ ভরে ছায়াঘন মেছুর বিকেলে
আকাশে মেলেছে পাখা নীড়-ফেরা পাখিদের সার ;
সহসা গোধূলি নামে পলাশের রঙে রঙ ঢেলে—
যখন পসরা শেষে ঘরে ফেরে হাটুরে আবার।

বাসর-স্বপ্ন চোখে ইছামতি ভরা-যৌবনে
লিখেছে তোমার বুকে ধূপছায়া রাত্রির নাম,
কাজল-আকাশ জুড়ে কত তারা প্রহর গোনে ;
এখন অবাক লাগে : সোনার সেদিন হারালাম।

আবার জন্ম হোক। কাশফুলে ভরা তটভূমি,
উদাস আকাশ আর মোহময় সোনা-রোদ-হাসি,
হলুদ নদীর ঢেউ, শ্যামলিমা সেই পটভূমি,—
তুমি তো মাটির মেয়ে—তোমাকেই আজো ভালোবাসি।

এখনো স্মৃতির নামে শুধু আসে বেদনার ভীড়,
আমার সোনার গ্রাম—সাতক্ষীর, শান্তির নীড়॥

জোনাকিরা

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

দ্বিতীয় বর্ষ। সাহিত্য

এবং সে সূর্য কাল পৌঢ় দিনে ঝ'রে গেল মুখর বিকালে
সন্ধ্যা ব্যস্ত হলো সূর্যের সোনার সৌরভে
হিমাচল শয্যা পাতে, তারার আসর দূর নভে
শুরু হবে হবে
আবিরের কলোচ্ছ্বাস ক্লান্ত হয় সমুদ্রের জলে।

অথচ সে রাত্রি এলো পক্ষপুটে তিমিরের নেশা
আমাকে সে বন্দী করে দোতলার একমাত্র ঘরে
বলে এই রাত্রি তোর :
অরণ্যানী মৌন হলে পরে
সে চাঁদ হৃদয়ে আসে ; জোনাকিরা কুম্‌কুম্ টিপ্
জরির নক্সা গাঁথে
সুরের প্রপাতে,
নক্ষত্রকন্যা জ্বালে মেঘে মেঘে দীপ !

কিংবা সে হাস্নুহানা পরশে পুষ্পিত হয় হাওয়ার ভীড়ে,
তাই সে আমাকে ডেকে চুপি চুপি বলে ধীরে ধীরে :
এখনি কাজল হবে সে আকাশ আলোকের শোকে
রাত্রি দিয়েছে পত্র :
নিশীথ শিশিরে
সব আলো নিভে গেলে মালকোষে তব সুরলোকে
আমাকে ইংগিতে ডেকো তোমার সে লাজনম্র সুরে

নিজেকে হারিয়ে পেতে দোতলার একমাত্র ঘরে
আপন বাসরশয্যা রাত্রির শুভ্র জোছনাতে
জোনাকিরা ফুল হয়ে ফুলশয্যা তাই মোর পাতে ॥

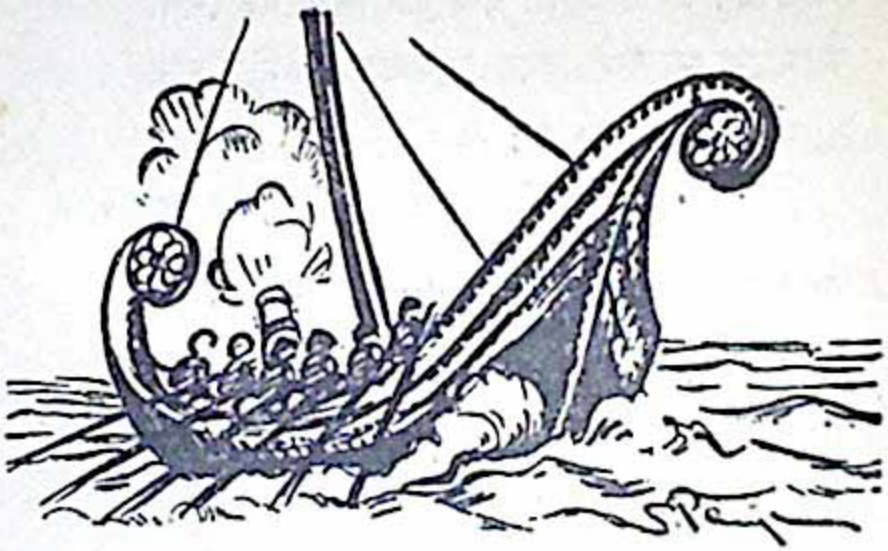

সূর্য-সন্ধান

শ্রীকালীপদ রায়

প্রথম বর্ষ । সাহিত্য

জীবনের সূর্যগুলো মরে-মরে গেল :
জাগাও—জাগাও আজ তারায়-তারায় বসন্তের জোছনামল্লার,
রক্তে আর রেখো না স্বাক্ষর সূর্যাস্তের তিমিরব্যথার।
যাক ফিরে সামুদ্র-বলাক—আরণ্য-বিহগ ফিরে যাক,
লুপ্ত হয়ে যাক ওই প্রতীচীন আসমানী অলক্তকরাগ
মৃত্যুর সঘন অন্ধকারে ;
তবু ওহে যাত্রীদল,
যাত্রা করো—যাত্রা করো অন্ধকার জিঘাংসার অর্চি-অভিসারে
অশ্লেষা-মঘার শুভক্ষণে,
মৃত্যুর-শোণিতে-গড়া নিশীথের প্রপঞ্চ-আহ্বানে।
তোমাদের খড়্গতেজে আর
নিয়তি-নির্মম নভে বিদ্যুৎবিলাসে
জীবনের ঘূর্ণি ঝড় উঠুক—উঠুক
সাহারায়-গোবিতে-পামীরে,
গঙ্গা-ভল্গা-মিসিসিপি-মিসৌরির তীরে ;
ভস্মীভূত হয়ে যাক কলুষের অমেয় তমিস্রা,
হৃদয়ের কন্দরে-কন্দরে জেগে থাক উদয়ের চির-প্রতিশ্রুতি।
না থাক একক সূর্য, আছে-আছে কোটি-কোটি ইন্দ্রনীল তারা,
আছে ধ্রুব-অরুন্ধতী, আছে সন্ধ্যা, আছে শুকতারা,
সে-আলোকে খুঁজে নেব অনন্ত সূর্যেরে
শত-শত সাম্রাজ্যের-সীমা-ভাঙা উদ্দাম উল্লাসে,

চীনের প্রাচীর টুটে, শতলক্ষ এভারেস্ট উল্লঙ্ঘন ক'রে,
পৃথিবীর পঞ্চ-মহাদেশে।
দেব নাকো এ-রাত্রিকে ক্ষণ-অঙ্গীকার,
জীবনের অস্তসূর্যে প্রাণ দেব প্রতিভার তুরঙ্গ-সওয়ার ;
দেখা দিক ব্যতীপাত, ধূমকেতু উঠুক আকাশে,
ভূমিকম্পে, উল্কাপাতে, সংবর্তরভসে
খুলে-খুলে যাবো যাত্রীদল অন্ধকারে মৃত্যুর-কপাট,
অবশেষে একদিন জীবনের মহাজিজ্ঞাসায়
ফিরে পাব প্রসববেদনা,
জন্ম দেব কোটি-কোটি সূর্যের সন্তান—
সে-আলোকে এ-আকাশ হয়ে যাবে ভাস্কর-স্বরাট্।

INTER COLLEGIATE REGATTA CHAMPIONSHIP

ASUTOSH COLLEGE TEAM

Standing : A. Chatterjee, D. Sengupta, K. Bose, R. Chatterjee (Capt.)
Sitting : K. Ghosh, B. N. Chakravarti (Prof-in-charge of Games), Prof. K. Maity (President Students' Union), P. Bose (Games Secretary).

INTER-COLLEGIATE WEIGHT LIFTING
AND
BODY BUILDING CHAMPION

Standing (Left to Right) : Tarak Pal, Prabhat Dutta, Asim Ganguly, Amal Sen.

Sitting (Left to Right) : Biswanath Chakraborty (Prof-in-charge of games), Kantish Maity (President, Students' Union), Soroshi Gangooly (Physical Instructor), Prabhat Ghose (Games Secretary).

প্রবন্ধ

আধুনিক বাংলা কাব্যে রোমান্টিসিজম

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

প্রাক্তন ছাত্র

আধুনিক বাংলা কাব্যে নাকি দুটো পথের পথিককে পাঠকেরা দেখে থাকেন—তার একটা হলো—প্রাচীন কল্পনা পথের অভিযাত্রিক দল, দ্বিতীয়টি হলো বর্তমান বাস্তব-কঠোর রূঢ় রাস্তায় ঘোরাফেরা করা কবিতা। অর্থাৎ গতানুগতিক পথে রোমান্টিক চেতনায় উদ্দীপ্ত কবিতা, আর দ্বিতীয়তঃ, রিয়ালিষ্ট উপলব্ধি-সম্বলিত রূঢ় বাস্তব কাব্য।

আমি কাব্যকৌশলের এই বিভাগ মানিনা, এবং কেন মানিনা—তার বিশদ পরিচয় দেবারও দরকার বোধ করছি না—শুধু একটি কথা বল্লেই বোধ হয় বলা ঠিক হবে যে কবিতাকে রোমান্টিক হতেই হবে—বিষয় বস্তুতে, উপজীব্য খাদ্যসংস্থানে সে বাস্তবতন্ত্রের বস্তিতে বাস করুক বা কল্পনা বিলাসের চিলে কুটুরীতে থাকুক—বিন্যাসে বা প্রকরণে তাকে রোমান্টিক কুলোর বীজনে দেহ-লালিত্যকে শীতল রাখতেই হবে—নইলে তা ত' কবিতা হবে না। দুর্দ্ধর্ষ জাপানি বোমায় অসহায় চীন যখন বিধ্বস্ত হচ্ছিল, তখন রূঢ় বাস্তববাদী কবিকে বলতেই হবে—

জাপ-পুষ্পকে ঝরে ফুলঝুরি
জ্বলে ছাঙ্কাও। (সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

—নইলে—তা কাব্যপর্যায়ে উন্নীত হবে না। রূঢ় রিয়ালিষ্ট কবিতার আরো গোটা কয়েক লাইন উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরলেই দেখা যাবে—'রোমান্টিকতা' ছাড়া কাব্যের অন্য গতি নেই। লোক কোলাহল মুখর ধর্মতলার একটু বর্ণনা দেওয়া যাক—

এখানে শহর লক্ষ কণ্ঠে প্রগল্‌ভ
এ-মাটি মাড়িয়ে, এ সীমা ছাড়িয়ে,
কী বলবো?
অনেক স্রোতের ধারণা,
বহু পদাহত ধুলোয়, হাওয়ায়
বহু ইচ্ছার চারণা।
নকল দাঁতের গৌরবে কাল মুষিক মুখর সর্বদা,
নকল হাতের ধাক্কায় ঘড়ি এখানে ডোবায় সব কথা। (হরপ্রসাদ মিত্র)

এক ফালি চাঁদের মহিমাকে কবি এ যুগের কাস্তে বলে বর্ণনা করতে দ্বিধা করেননি। পরবর্তী কনীয়ান কবি আবার চাঁদকে ঝলসানো রুটি বলতেও কুণ্ঠিত হন নি। সামাজিক বাস্তববোধ চেতনাকে যে গ্রামে বা ঘাটে বেঁধেছে—সেখান থেকেই ঝংকৃত হয়েছে সুর, কিন্তু কল্পনার অনুলেপন আছে—সর্বত্র; নইলে তা কাব্য হয় না।

কেন এই কল্পনা সিঞ্চন—এ প্রশ্ন উঠতে পারে। একথা ঠিক যে প্রবন্ধের মধ্যে—বিশেষ করে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক রচনায় যুক্তির পারম্পর্য রক্ষা করা এবং বিষয়ের প্রতি নিষ্ঠা দেখানোর প্রয়োজন যতটা, সাহিত্যাশ্রয়ী কোনো গদ্য রচনার চত্বরে দাঁড়িয়ে এই নিষ্ঠা রক্ষার ততটা আবশ্যকতা মনে থাকে না। রম্যরচনায় বিন্যাসকে সুন্দর করতে হয়, ভ্রমণ কাহিনী অনেক ক্ষেত্রে কাব্যধর্মে দীক্ষিত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ যখনই রচনাকে সাহিত্য বলে চিহ্নিত করি—তখনই তাকে বাইরের জগতের রূপলোক থেকে সরিয়ে এনে একটু স্বতন্ত্র করে তুলি। বস্তুজগতের যে রূপ-বিলাস, পাঠকের মানসলোকে তার প্রতিষ্ঠা করাবার জন্যে কবি বা সাহিত্যিক আপ্রাণ চেষ্টা করেন—ফলে যা কিছু অপরূপ—তাঁর মনের সম্পদ বা ভাব, তাকে রূপের মাধ্যমে হাজির করতে হলে ভাষায় ভাষাতীতকে আনতে হয়, সাহিত্যকর্ম বা কবি কর্মের এই হলো মূল কথা। এই জন্যেই কবিকে ভাষার সাহায্যে ভাষাতীত ব্যঞ্জনা ফোটাতে হয়, আর তাই তিনি ছন্দের মাধ্যমেই হোক, অলংকরণের মাধ্যমেই হোক সুর সৃষ্টি করেন।

অবশ্য কবিকর্মের এই কথা চরম বলে মেনে নিলে কাব্যের বিচারে দেহাত্মবাদকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে, এবং এই যুগে কাব্যের রস সম্পর্কে অজ্ঞান থেকে শুধু এর শরীরের লালিত্য ও লাবণ্যের ওপরই নির্ভরশীল হতে বলা শুধু অন্যায় নয়, পাপকর্মও বটে।

কিন্তু কাব্যের রসের আস্বাদ ঘটে এই সৌন্দর্য উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে। প্রেমেন্দ্র মিত্র বললেন—'মন দিয়ে মন হাতড়াই, তবু তারে কতটুকু পাই'? এইটুকু বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে একান্ত আপনার জনকে নিবিড়ভাবে পাওয়ার যে তীব্র আকুলতা—তা ত' মন হাতড়ানোর উপমাগর্ভ ছবির মধ্যে দিয়েই পাঠকের মনে রসের সঞ্চার ঘটায়। 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য' বললে যে অতীত সৌন্দর্যের প্রতীক বর্তমানের মধ্যে আশ্চর্য ও আনন্দ রসের প্লাবন ঘটায়—তার মূলে কি কবির এমন সুমোহন বিন্যাস কাজ করে না? তাই বলছিলাম যে, কাব্যের অনেকখানি—সবখানিই বুঝিবা, দাঁড়িয়ে থাকে কাব্যের কায়দা, কৌশল আর মর্জির ওপর।

সেইজন্যেই কবিতা যখন বাস্তব জীবনের কথা বলতে চেষ্টা করে—তাকে বাস্তবাতীত করে নিতে হয় কল্পনার ভিয়েনে, নইলে তার পোষ্টারের মতো চেঁচিয়ে মরাই সার হবে, চিরদিন তার কথা কেউ মনে রাখবে না। বাস্তবিক জীবনের সমস্ত কিছুই—এর সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, হর্ষ-বেদনা, মিলন-বিরহ—সবই আমাদের পরিচয়গম্য, সব কিছুকেই আমরা ধরতে পারি, কিন্তু দৈনন্দিন দরকারের বেড়া দিয়ে যে প্রত্যহমুখী বাস্তবজীবনকে ঘিরে আমরা ঘুরি বা আমাদের হৃদয়ানুভূতি আবর্তিত হয়—সাহিত্যের মাথাব্যথা কিন্তু সেগুলিকে যথাযথভাবে নাড়াচাড়া করে নয়। প্রাত্যহিক প্রয়োজনের চৌহদ্দি ছাড়িয়েও যে সৌন্দর্য বা মাধুর্য আছে—তাকেও ত' কাব্য রূপদান করে—সেখানে কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে আমরা উঠি, দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তায় তাই মোহের আরক মেশাতে হয়—তবেই তা কাব্যত্বের ছাড়পত্র পায়। এক কথায় অতি সংক্ষেপে বলতে হয় যে কাব্যকে রোমান্টিক হতেই হয়। কবিতা মানেই—রোমান্টিকতার বীজে তার জন্ম হবেই হবে।

তবু যদি একটা মাত্র পরিচয়টীকায় রোমান্টিসিজিমের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে হয়, যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—রোমান্টিসিজম কি হে—তবে এক কথায় বলা খুব শক্ত।

আমরা বলি—ছেলেটি বেশ রোমান্টিক পোষাক পরেছে। বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে বোধগম্যতার একটি সেতু নিশ্চয়ই নির্মিত হয়ে যায়। আমরা আরও বলি—'একটি রোমান্টিক ছবি দেখে এলাম'। 'এটি কিন্তু একটি রোমান্টিক উপন্যাস'। 'তোমার চোখের রোমান্টিক চাহনি আমাকে মুগ্ধ করে'। 'কি রোমান্টিক দৃশ্যপট!' —ইত্যাদি ক্ষেত্রে রোমান্টিক শব্দটা হামেসা ব্যবহার করছি, কিন্তু যদি বলা যায়—রোমান্টিসিজম্ জিনিসটা কি—একটু বুঝিয়ে দাও—যেমন করে পরিচিত ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝানো যায়, প্রয়োজন হলে সামনে হাজির করানো যায়—তেমনি ভাবে রোমান্টিসিজমের স্বরূপ উদ্ঘাটন করবে কি?

সম্ভব নয়। কেননা রোমান্টিক চেতনা আমাদের মনোলোকের সম্পদ; যেহেতু সে রূপ-জগতের বাসিন্দা নয়, তাকে ত' বাইরে প্রকাশ করা যায় না। অথচ এই রোমান্টিসিজম্ সম্পর্কে আমাদের মনে একটা না একটা সূক্ষ্ম ধারণা বা বোধ আছে, কিন্তু সেই বোধকে আমরা নির্দিষ্ট সংজ্ঞার দ্বারা বা পরিচিত ভাষার মাধ্যমে সহজেই প্রকাশিত করতে পারি না।

বর্ষার পর একদিন হঠাৎ সকালে আকাশের দিকে হয়তো চোখ পড়লো। ঘন নীল আকাশ, নির্মেঘ, নিটোল চমৎকার স্বাস্থ্যবান। রোদের আলোয় থল থল করে

হাসছে যেন। আশেপাশের গাছের সেই আলোর অভিবন্দনা সুরু হয়েছে। সদ্যবর্ষার জলে স্নাত গাছের পাতার রঙও কি টকটকে সবুজ! আকাশ বাতাস—সবকিছুকেই যেন আমরা বিস্ময়মণ্ডিত করে দেখে ফেলি। শারদ সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে নিতান্ত পরিচিত প্রত্যহকে অন্ততঃ কয়েকটি মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হই। এই যে বাস্তবকে ভুলে থাকা, এবং পরিপার্শ্বকে বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে দেখা—এই হলো রোমান্টিসিজম্। রোজকার যা চেনা জানা,—এ যে তার চেয়ে ভিন্ন, যা প্রাপ্তির দ্বারা অধিগত, এ যেন তার চেয়ে অন্য কোন্ সম্পদ। এই দৃষ্টিভংগীই রোমান্টিসিজম্। রোজকার যা চেনা জানা বস্তু, সেগুলির মধ্যেই যেন হঠাৎ কোন্ অপরিচিতের আবির্ভাব উপলব্ধি করা, যা বাস্তব, যা প্রত্যহের জীবনের অভিসংগ—তাকে যেন বাস্তবাতীত কোনো লোকে উন্নীত করে দেখা—এরই নাম রোমান্টিসিজম্।

নির্জন নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কোনো গাছের ডালে বসে কাক ডাকছে—এর কর্কশ কণ্ঠস্বর ত' নিত্যদিনের শ্রবণসংগী। কিন্তু কবি এই প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যে কি যেন এক অনির্বচনীয়ত্ব উপলব্ধি করেন—

কোথায় কাদের ছাদে সমস্ত দুপুর
কাক ডাকে, শুনি।
বোঝা আর বোঝাবার
প্রাণান্ত ক্লান্তির শেষে
অকস্মাৎ খুলে যায় আশ্চর্য কবাট।
কাক ডাকে, আর,
সে শব্দের ধু ধু করা অপার বিস্তার
হৃদয়ে ছড়ায় সব শব্দের অতীত
ধ্যান-গাঢ় প্রশান্তির মতো। (প্রেমেন্দ্র মিত্র)

অনেকে বলেন—বিস্ময় ও রহস্যময়তাই রোমান্টিক চেতনাকে জন্ম দান করে। তাই দূরের ঘটনা—অজানা জীবন—এইগুলিই রোমান্টিক কাব্যের উপজীব্য বিষয়। সেইজন্যে আকাশের চাঁদ, কুয়াশাঘেরা রাতের মায়া রোমান্টিক কাব্যের সম্মোহনী জীবনশক্তি দানের সহায়ক। কোনো ইংরাজ সমালোচক বলেছেন—Romantic poetry invariably deals with longing. এই জগতের, এই বস্তুময় জীবনের যে পরিচয় সহজলভ্য বা স্পষ্টপ্রত্যক্ষ—সে জীবন কবির বুঝি কাম্য নয়, বাস্তব লোকের বাইরে, অতীন্দ্রিয় জগতের সীমানাঘেরা যে মায়াময় জীবনরূপ, তাকে আশ্রয় করেই কবির ভাবনা।

কিন্তু রোমান্টিসিজম্ সম্পর্কে এই ধারণা চিরন্তন ঠিকই, তবু এর সংগে বস্তুতন্ত্রের দিক থেকে আমি আরো কিছু সংযোগ করতে চাই। বস্তু জগতের রূঢ় সত্য কেন যে রোমান্টিক কাব্যের বিষয়লগ্ন হতে পারবে না—তা আমি ভেবে পাই না। প্রতিদিনের বস্তু সাহিত্যে এসে যদি অপরিচিত না থাকে, কল্পনার সংযোগে যদি তার নতুন করে রূপান্তর ঘটে—তবে তাতেও ত' সাধারণোত্তর রূপ এসে ধরা পড়ে, প্রত্যহের অতীত সৌন্দর্য ধরা পড়ে। কাব্যের যে কোন উপজীব্যকেই রোমান্টিকতার নামাবলী গায়ে-চড়ানো যায়—এই হচ্ছে আমার মত, অপরিচিত, কুয়াশাঘেরা, মায়াচ্ছন্ন, রহস্যময়, অজানা অচেনা পরিবেশই যে রোমান্টিক কাব্যের বিষয়—এ আমি মানতে পারিনা; অন্ততঃ আজকের বাংলা কাব্যে দেখতে পাচ্ছি রৌদ্রকঢ় জীবনাভাসও স্মিত চন্দ্রালোকিত জীবনবিলাসের চেয়ে কম রোমান্টিক হয় না—যদি তাতে কল্পনার যথার্থ মিশেল দেওয়া যায়।

রোমান্টিক কবির পক্ষে অতৃপ্ত থাকাটাই যে একান্ত দরকার—এ ধারণাকেও আমি যথার্থ বলে মান্য করি না। এই প্রবন্ধে উদাহৃত কবিতাগুলির প্রতি মনোনিবেশ করলে দেখা যাবে যে, কবি কোথাও নিজের অখুসি মনের প্রত্যক্ষ প্রকাশ করেন নি। সুতরাং প্রাচীন রোমান্টিক ব্যঞ্জনার বা সংজ্ঞার শাসনে আজকের কাব্যকে চোখ না রাঙালেই বোধহয় যথার্থ ন্যায় বিচার সম্ভব হবে।

আমার মোদ্দা কথা হচ্ছে যে, প্রত্যেক কবিকর্মই রোমান্টিক। রোমান্টিক মন্ত্রে দীক্ষিত না হলে কোনো কাব্যকেই সাহিত্যের গদীতে বসতে দেওয়া উচিত নয়। বস্তুতন্ত্রের এলাকা কবিতার জন্মভূমি বলে চিহ্নিত হতে দোষ নেই, বরং আজকের কাব্যে বাস্তব জগৎ ও প্রত্যহের জীবনই কবিকর্মের প্রথম সোপান হলে সুখের হবে, কিন্তু তাকে কবিকল্পনার সৌকর্যকিরীট পরিধান করতেই হবে। সৌন্দর্যের, কল্পিত ব্যঞ্জনার স্বর্ণরঙে যদি বস্তুজগৎ ঝলমল করে না ওঠে—তবে তা কাব্যই নয়। সুতরাং কবিতা মানেই রোমান্টিক চেতনা সম্বলিত জিনিস। তাই কাব্যে রোমান্টিকতা বলা মানে একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি করা। আর এই রোমান্টিকতার ছোট্ট সংজ্ঞা হচ্ছে—বাস্তবকে কবিকল্পনার দ্বারা বাস্তবাতীতের পর্যায়ে উন্নীত করা। আজকের দিনে বাংলাদেশের ছোট বড় মাঝারি সব কবিই ত' কল্পনার সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাঁদের বক্তব্যকে প্রাণময় করে তুলছেন—এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই আজকের যেগুলি আধুনিক বাংলা কাব্য—তা নিশ্চয়ই রোমান্টিক দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, হোক না তা বাস্তবাত্মক!

কবিতা

শ্রীদিলীপকুমার নন্দী

তৃতীয় বর্ষ। সাহিত্য

আমরা অনেকেই কবিতা লিখি বা পড়ি। কিন্তু কেন? এ প্রশ্ন অনন্ত জিজ্ঞাসার মধ্যে একটা বুদ্বুদ বিশেষ। অনেক সময় অবচেতন মনে নাড়া দিলেও—সাড়া পায় না। তাই কিছু আলোচনার চেষ্টা করব। যদিও জানি, মানুষের উপলব্ধির ভিত্তিতে অগণিত এর উত্তর।

আমরা সাহিত্যকে, বিশেষতঃ কবিতাকে, ভালবাসি তখনই যখন করবার মত বিশেষ কিছু হাতে থাকে না, ভেবে ভেবে কল্পনার মায়া-জাল বুনবার থাকে অফুরন্ত সময়, আর দিগন্তবিসারী নীল আকাশের এক ফালি সাদা মেঘের ভেলা চোখের ওপর এসে পড়ে জাগায় এক অব্যক্ত মধুর অনুভূতি। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত যখন আড়াল দিয়ে চলে যায়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, প্রাণ যখন সভ্য, যান্ত্রিক জীবনের একঘেয়েমিপূর্ণ কোলাহল মুখর জগতে হাঁপিয়ে ওঠে, তখনই ইচ্ছে করে গল্প-কবিতা ও গানের অতলতলে তলিয়ে যেতে; মন তখন উতলা হয় কোন এক রসমধুর মাধুর্য্যের মধ্যে আত্মস্থ হতে। এমন সময় বাইরের কোন কিছু দেখলেই সংবেদনশীল হৃদয়ে এক নব চেতনার সঞ্চার হয়, সেটা ব্যক্ত করা কতকটা দুরূহ হলেও, অসম্ভব নয়। "মানব মনের এই অনির্ব্বচনীয় ভাবনা কল্পনা যখন অনুভূতির জারকরসে সিঞ্চিত হ'য়ে যথাবিহিত শব্দ সম্ভারে বাস্তব সুষমামণ্ডিত চিত্রাত্মক ও ছন্দোময় ভাষায় প্রকাশিত হয়, তখন তাকে আমরা নাম দিই কবিতা বা কাব্য। তাই প্রত্যেক কাব্য একটি বিশেষ সৃষ্টি, কলের তৈরী জিনিষ নয়।" * আর যে লেখক "বাহিরের জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ বা আপন মনের ভাবনা কল্পনাকে অনুভূতি রঞ্জিত ছন্দোময় তনু-শ্রী দান করিতে পারেন তাহাকেই আমরা কবি নামে বিশেষিত করি।" † রবীন্দ্রনাথের কথায়—"ভাবের এই কথাকে সঞ্চার করিয়া দিতে হয়। তাই তাহার জন্য নানাপ্রকার আভাস-ইঙ্গিত, নানাপ্রকার ছলা-কলার দরকার হয়।" সুতরাং, "তাহাকে কেবল বুঝাইয়া বলিলেই হয় না, তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে

---

* কাব্য জিজ্ঞাসা—অতুল গুপ্ত।

† সাহিত্য-সন্দর্শন—শ্রীশচন্দ্র দাশ।

হয়।" (সাহিত্য) তাই কবিরা শুধু কবিতাই লেখেন না, সৃষ্টি করেন। নিজের অনুভূতি অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। তাই নিজের ভাব অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করবার, গেঁথে দেবার প্রকৃষ্ট উপায় ছন্দের বন্ধনের মাধ্যমে। সে জন্যেই বোধ হয় ভাষা আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভাব কবিতার। আদি কবি বাল্মীকির মুখ দিয়ে ক্রৌঞ্চশোকে শোকার্ত ব্যথিত হৃদয়ের শোক গাঁথাই হ'ল আদি ভারতীয় কাব্য তথা কবিতা।* তাঁর হৃদয়ের এবম্বিধ অনুভূতি ম্যাথু আর্নল্ডের কথায়—সেটা সত্য; এবং এর বহিঃপ্রকাশ কাব্য-সৌন্দর্য্যের মধ্যে। কাব্যে যে সৌন্দর্য্যের প্রকাশ সেটা চিরন্তন। সুতরাং সত্য ও সুন্দর উভয়েই শাশ্বত।† এই শাশ্বত সত্য যখন অনুভূতির আকারে স্পর্শকাতর ব্যক্তির হৃদয়-বীণায় আঘাতে আঘাতে সুরের ঝংকার তোলে তখনই ব্যক্তির স্বরূপ তাকে ভালবাসে, কাব্যের সার্থকতা প্রতীয়মান হয়। তারপর, মানুষের হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে চলে এর পুনরাবৃত্তি, ফলে কবিতা হয় স্মরণীয়—memorable. এই memorability বা স্মরণীয়তা যখন কবিতা হারায় তখন সে মানুষের জীবনের একটা বৃহৎ ক্ষেত্র থেকে তার অত্যাবশ্যক স্থানটি হারাতে বসে। হৃদয়ই কবিতার নিজস্ব স্থান। সুতরাং বাহ্যজগতের কল-কোলাহলে, যন্ত্রের ঘর্ঘরধ্বনিতে, —ism এর মাপকাঠিতে এর বিচার করলে প্রকারান্তরে অবিচারই করা হ'বে। কারণ, এ সমস্তই গতিশীল, পরিবর্তনশীল, সমস্যা কণ্টকাকীর্ণ সমাজের এক একটি অঙ্গ—যদিও এরা বাস্তব সত্য (true), কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; আজ আছে, কাল নেই; না হয়, আছে রূপান্তরিত আকারে। আর হৃদয়ের যে ভাব, যে উদ্দীপনা, যে রোমাঞ্চ সেটাও বাস্তব। তবে এটা নিত্য সত্য (truth)। কোন হিত সাধনের উদ্দেশ্য সেখানে নেই, নিছক ভাল লাগে তাই বলি ভাল। এই ভাল লাগার পরে আসে কাব্যের বিচার। অনুসন্ধান চলে by-product-এর। বুদ্ধি-জীবীর বুদ্ধি তাঁকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, তার গতি করে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত—কাজে লাগায় সমানহিতার্থে। তাই কাব্যকে অনেকসময় সাময়িক-ভাবে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ অবস্থায় সমাজের যত্রতত্র ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, কিন্তু যখন কাব্যকে বিচার করব তখন তার প্রকৃত সত্তাকেই শুধু গণনায় আনব; by-product তখন হিসাবের বাইরে।

---

* মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

† It is a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and beauty.

জ্যোতির্বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা

অধ্যাপক অসিতকুমার রায়

(রসায়ন বিভাগ)

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, "A country is known through the scholars she produces." আজকের দিনেও যাঁরা তাঁদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চ্চাদ্বারা ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করে ভারতকে সমগ্র পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছেন, তাঁরাও দেশবাসীর কাছে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অতি পুরাতন দেশ এই ভারতবর্ষ। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঐতিহ্যে ভরা এই দেশের ইতিহাসে যে কয়জন মনীষীর নাম লিখিত থাকবে, তাঁদের মধ্যে প্রাচীনকালের ভাস্করাচার্য্য, আর্য্যভট্ট, এবং বরাহমিহিরের নামের পাশেই থাকবে বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডক্টর মেঘনাদ সাহার নাম। শুধু ভারতের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার নাম অমর হয়ে থাকবে।

ঢাকা জেলার এক অতি দরিদ্র ও অখ্যাত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নিদারুণ অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে তাঁর স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ছেলেবেলা হতেই তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল একটা অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি ও স্বদেশপ্রীতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায়ই তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯১৫ সালে ফলিত গণিতবিদ্যায় এম. এস্‌সি. পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এর পর মেঘনাদ আরম্ভ করেন তার গবেষণাকার্য্য। পাথেয়

হিসাবে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তিনি বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্রবল, শিক্ষার ধারা ও স্বদেশপ্রীতি। সেই যুগের পথিকৃৎ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সাহাকে খাঁটি মানুষ বলে চিনতে পারলেন; তিনি তাঁকে নিয়ে আসেন কলিকাতার নবপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগে। এখান হতেই সুরু হয় তার জীবনের এক নতুন দিক।

মেঘনাদ সাহা যে যুগে তাঁর গবেষণা আরম্ভ করেন সে যুগে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তনের স্রোত বয়ে চলেছিল। ড্যালটনের যুগের ধারণা ছিল,—"Thou shalt not split an atom". এ ধারণা ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে। পরমাণু সম্বন্ধে নতুন করে আঁক কষে তথ্য নির্ণয় করে চলেছেন অধ্যাপক নিয়েলস্ বোর। এমন সময় ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক "কোয়াণ্টাম তত্ত্ব" প্রবর্তন করলেন। ওদিকে আইনষ্টাইন নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের সূত্রের মধ্যে একটু একটু সন্দেহ প্রকাশ করছেন। এমন সম্ভাবনাও দেখালেন—আলো পৃথিবীপৃষ্ঠে নিউটনের সূত্র অনুযায়ী সরলরেখায় চললেও অধিকতর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবিশিষ্ট নক্ষত্রের পৃষ্ঠে বেঁকে যাবে। বিজ্ঞানের জগতে তখন জোয়ার এসেছে, তা সত্ত্বেও পুরাতনকে ছেড়ে নতুনকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে সবারই একটু সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অধ্যাপক সাহা তখন হতেই আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ, বোরের পরমাণুতত্ত্ব ও প্ল্যাঙ্কের কোয়াণ্টামবাদের রাজ্যে আনাগোনা সুরু করেছেন; তিনি গভীরভাবে জ্যোতি-বিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানে ব্যাপৃত হয়েছেন।

পরমাণুতত্ত্বের আলোচনা করে বৈজ্ঞানিকগণ এই সিদ্ধান্তে পৌছেন যে—মৌলিক পদার্থের পরমাণু কেন্দ্রগত পজিটিভ বিদ্যুৎপিণ্ড ও ইলেকট্রনের (নেগেটিভ বিদ্যুৎকণার) সমষ্টিমাত্র। ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রের বস্তুর চারিদিকে বিভিন্ন কক্ষপথে নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি বজায় রেখে দ্রুত ঘুরে বেড়ায়। শক্তির আদান-প্রদানজনিত ব্যাপারে ইলেকট্রনের অবাধ গতি কেন্দ্রের দিকে বা বাইরের কক্ষের দিকে হতে পারে। বাইরে যাবার সময় ইলেকট্রন শক্তিকে সাথী করে বটে, কিন্তু ফিরবার সময় এরা আহৃত শক্তিকে বাইরে ছেড়ে দিয়ে নিজ নিজ কক্ষে ফিরে আসে। ইলেকট্রন থেকে ছেড়ে দেওয়া শক্তি ফটো ফিল্মের উপর নির্দিষ্ট দাগ হিসাবে দেখা দেয়। এই দাগ দেখে বোঝা যাবে কোন মৌলের ইলেকট্রন শক্তির হাটে বেচাকেনা করেছে। শক্তির মাত্রাধিক্য ঘটলে ইলেকট্রন আর পরমাণুতে ফিরতে সক্ষম হয় না। ফলে ইলেকট্রনবিহীন যে পরমাণুর সৃষ্টি হয় সেগুলি পজিটিভ বিদ্যুৎবাহী হয়ে পড়ে।

এদের বলা হয় "আয়ন"। পরমাণু আয়নিত হ'তে গেলে ইলেকট্রনের কতটা শক্তি প্রয়োজন তার মাত্রা হল "আইয়োনাইজেসন পোটেনশিয়াল।"

জানা গেছে, মোটামুটি ৯২টি মৌলিক উপাদান সম্বল করে এক অজ্ঞাত রহস্যময় রাসায়নিক বন্ধনের দ্বারাই বিচিত্র বস্তুপুঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের মনে গভীর বিশ্বাস ছিল,—বিপুল বিশ্বের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ, তারকা-নক্ষত্রের সৃষ্টিরহস্য এই ৯২টি মৌলিক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর উৎপত্তি কিরূপে ঘটেছিল সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে—কোন এক অজ্ঞাতকুলশীল অতিকায় নক্ষত্রের আকর্ষণের ফলে সূর্য্য থেকে কতকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; এই বিচ্ছিন্ন অংশই কালে সৌরজগতে পরিণত হয়। জ্যোতির্বিদ্‌গণের ধারণা ছিল, পৃথিবী ও সূর্যের পৃষ্ঠে অবস্থিত এই ৯২টি মৌলিক পদার্থের মধ্যেই সৃষ্টির রহস্য নিহিত রয়েছে।

ধর্মসাধক যেমন জিজ্ঞাসা করেছেন, ঈশ্বর কে? কোথায় তাঁর স্থিতি? সে যুগের বৈজ্ঞানিকও তেমনি জিজ্ঞাসা করেছেন—সূর্য কি? কোথা থেকে আসল এই সূর্য? কি এই ব্রহ্মাণ্ড? সূর্য কি পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, না পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে? কি এদের সম্বন্ধ? বিজ্ঞানের এক রহস্যময় রাজ্য আবিষ্কার করেছেন তাঁরা। বৈজ্ঞানিক বলতে চেয়েছেন—এই ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করে একদিন পরমাণুর মহাসমুদ্র ছিল,—আর চারিদিকে ছিল অন্ধকার। আইনষ্টাইন বললেন,—"কালের ধর্ম বিশ্ববস্তুকে সত্যের দিকে—বিশ্ববস্তুর মিলনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলা"। নিউটনের কথায়—"বস্তু মাত্রই অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করছে"। এই আকর্ষণের একটা গতি আছে। কিন্তু এ সবের মাঝেও ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের যোগসূত্র যে কোথায়, তার কোন হদিসই পাওয়া যাচ্ছিল না। জানা গেল, এমন বহু সৌরজগৎ আছে যারা নীল আকাশের গায়ে তারা হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। এদের ঘিরে কত কথা, কত রূপ, কত সৌন্দর্য্যের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে!

সুদূর নক্ষত্রের বর্ণালী পর্য্যবেক্ষণ করে জানা যায় তাতে কি কি উপাদান আছে। সূর্যের বর্ণালীতে মাত্র চল্লিশটি মৌলের আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকদের মনে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করেছিল। মনে হল যেন সৃষ্টিরহস্য আর কোনদিনই উদ্ঘাটিত হবে না। পৃথিবী ও সূর্য হয়ত আলাদা; তাদের অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ যে কোথায় তা আর বোধহয় ধরা গেল না! বিজ্ঞানের এই নিদারুণ সঙ্কটের দিনে যখন প্রায় সকল বৈজ্ঞানিকই পথ হারিয়ে দিশেহারা হয়ে এগিয়ে চলেছেন, ঠিক সেই সময় ডক্টর মেঘনাদ সাহা

তাঁর "তাপ-আয়নন তত্ত্ব" (Theory of Thermal Ionisation) নিয়ে এই চরম সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে এলেন।

এতদিন সৌরমণ্ডলের বর্ণালীতে দেখা যাচ্ছিল যে এর নিম্নস্তরে রয়েছে রুবিডিয়াম্, সিজিয়াম্ প্রভৃতি লঘু মৌল ; ভারী মৌল ক্যালসিয়ামের কোন অস্তিত্বই এতে পাওয়া গেল না। আবার উচ্চ স্তরের বর্ণালীতে দেখা গেল ক্যালসিয়ামের অবস্থিতি-রেখা। এর কারণ স্বরূপ অধ্যাপক সাহা বললেন,—শক্তি সঞ্চয় করার ফলে ইলেকট্রন হারিয়ে পরমাণুর যদি আয়নে রূপান্তর সম্ভব হয়, তবে যেখানে প্রচণ্ড তাপের প্রাদুর্ভাব সেই সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রপৃষ্ঠে "কম আয়োনাইজেসন পোটেনশিয়াল"-ওয়ালা মৌলের আয়ন হিসাবে থাকাই স্বাভাবিক। এই কারণে সোডিয়াম, রুবিডিয়াম্, সিজিয়াম্ প্রভৃতি লঘু মৌল আয়নিত অবস্থায় উচ্চস্তরে থাকবে। উচ্চস্তরের বর্ণালী থেকে সূর্য্যের উপাদান জানতে গেলে এদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ক্রমোস্ফিয়ারের নিম্নস্তরের ও সৌর কলঙ্কের বর্ণালীতে এই কয়টি মৌলের ও হয়ত অন্যান্য মৌলের অবস্থিতির কথা জানতে পারা যাবে, কারণ সেখানে উত্তাপ অপেক্ষাকৃত কম। এর পর পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় ক্রমোস্ফিয়ারের বর্ণালী থেকে অধ্যাপক লক্‌ইয়ার যখন হিলিয়াম নামক মৌলটি আবিষ্কার করে ফেললেন তখন ব্যাপারটা এইভাবে বোঝান হল—আয়নিত ও অনায়নিত পরমাণুর খেলা ছাড়া এগুলো আর কিছু নয়। তাপ আয়নন (Thermal ionisation) শুধু তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে না, তার সঙ্গে চাপেরও সম্বন্ধ আছে। এই থিয়োরী থেকে বোঝা যাবে কোন পরমাণুর কত অংশ আয়নিত হবে, আর কত অংশ হবে না। সৌরকেন্দ্র থেকে ক্রমোস্ফিয়ারের উচ্চতর স্তরের দিকে চাপ ক্রমশঃ কমতে থাকবে। কম চাপের ফলে নীচের স্তরের দিকের সোডিয়াম, রুবিডিয়াম ও উচ্চস্তরে অবস্থিত ক্যালসিয়ম পরমাণুগুলি আয়নে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। "ক্রমোস্ফিয়ারের বর্ণালীতে Ca^+ আয়নের সঙ্কেত রেখা (H and K lines) দেখা যায়—চৌদ্দ হাজার কিলোমিটার উপরের স্তর পর্য্যন্ত। সোডিয়াম আয়নের সঙ্কেত রেখা দূর বেগুনীর অদৃশ্য অংশে দেখা দেয়।"

সমস্ত জগৎ সেদিন স্তব্ধ হয়ে শুনেছে এই বাঙালী বৈজ্ঞানিকের অতুলনীয় অবদানের কথা। এই আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর সাথে ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ তারকা-নক্ষত্রের যোগসূত্র রচিত হল। অধ্যাপক সাহা তখন প্রকৃতিকে অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে বেঁধে ফেলেছেন। রাবণ স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করতে চেয়েছিলেন—কিন্তু ডক্টর সাহা তাঁর অঙ্কের সিঁড়ি দিয়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, অনন্ত নক্ষত্রলোকে রূপ হতে রূপান্তরে

প্রবেশ করেছেন। বিশ্বের কল্যাণের জন্য তাঁর বিজ্ঞান সাধনা কত নব নব সৌন্দর্যের সন্ধান দিয়েছে! সৃষ্টির এই নিগূঢ় রহস্যটির উপরে আলোকসম্পাত করে তিনি দূরকে নৈকট্যের নিবিড় বন্ধনে বেঁধেছেন।

অধ্যাপক সাহার তত্ত্ব আবিষ্কৃত হবার পর জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু জটিল অমীমাংসিত প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল। এই আবিষ্ক্রিয়ার জন্য ১৯২৭ সালে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হলেন। আর্থার এডিংটন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা সাহার তত্ত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। দুই বৎসর পূর্বে অধ্যাপক সাহার ষষ্ঠিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে ক্যালিফোর্ণিয়ার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর অটোষ্ট্রভ্ লিখেছিলেন, "Prof. Saha's brilliant work on the ionisation of stellar atmospheres resulted in a revolution in scientific thought. His work has been a source of constant inspiration to virtually every astrophysicist during the present generation". পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী তাঁকে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থ বিভাগের সভাপতি হিসাবে অধ্যাপক সাহা তাঁর Theory of Thermal Ionisation সম্বন্ধে বলেন—"I have chosen to speak on Astronomy which poet Heine describes as "die alte, die ewig junge wissenschaft"—the old, the ever young science. Every period of 'Renaissance in physical and mathematical sciences' has been marked by an outburst of activity in Astronomy as well and very often the relations have been reciprocal."

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'তাপ-আয়নন তত্ত্বটি' ছাড়া আরও একটি বিশেষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাহার নাম অমর হয়ে থাকবে। Ionosphere'এর বিভিন্ন স্তর কি ভাবে সৃষ্টি হয় ও এই সকল স্তরের মাধ্যমে কিভাবে রেডিও তরঙ্গ (Vertical Radio-signals) সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে সে সম্বন্ধে গবেষণার জন্য তিনি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত "তাপ-আয়নন তত্ত্বের" সহায়তা নেন। সাহার এই সকল তথ্যাবলীর সহায়তায় অধ্যাপক মিলনে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক গবেষণার সুযোগ পান ও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সাহার তত্ত্ব থেকে একথাও বলা গেল যে, 'আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে অতিবেগুণীর অদৃশ্য অংশে' সূর্যের যে বর্ণালী পাওয়া যাবে তাতে

H, He, He^+, Fe^+ প্রভৃতি মৌলের ও আয়নের সংকেত রেখা দেখা যাবে। তখনকার দিনে এ সমস্ত তথ্য স্বপ্ন বলে মনে হত। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কলোরেডো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানীরা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ৮ কিলোমিটার উপরে V_2 রকেট পাঠিয়ে সৌর-বর্ণালীর ছবি তুলে সাহার তথ্যের মৌলিকতা প্রমাণ করেন। এই সব ব্যতীত সাহা তাঁরই প্রবর্তিত "Theory of Selective Radiation Pressure" এর সাহায্যে বস্তুর উপর আলোর চাপের সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। এ সকল গবেষণার জন্য বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজে তিনি গৌরবের আসন লাভ করেছিলেন।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মেঘনাদ সাহার এই অতুলনীয় অবদান আজ সকলকে বিস্মিত করেছে। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যই তাঁর জীবনে পথপ্রদর্শকের কাজ করেছে। পাণ্ডিত্যের নিদর্শনস্বরূপ অধ্যাপক সাহার জীবনের একটা ঘটনা বলা যেতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালের একটা বিশেষ দিন। লণ্ডন থেকে একখানা টেলিগ্রাম এসেছে ক'লকাতার ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার অফিসে। তাতে লেখা আছে এডিংটন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। ১৯১৯ সালের ২৯শে মার্চের পূর্ণ সূর্য গ্রহণের সময় তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, প্রবল আকর্ষণের ফলে বহুদূরের নক্ষত্র থেকে আসা আলো সূর্যের পৃষ্ঠে বেঁকে গেছে। বিজ্ঞানের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের সংবাদ এসেছে বটে, কিন্তু কেউই বুঝতে পারছেন না, আসলে ব্যাপারটা কি। নক্ষত্র থেকে আসা আলো সরল-রেখায় না এসে বেঁকে এসেছে। কি কারণে 'এই বেঁকে আসা' যুগান্তকারী হল তা বুঝবার মত পড়াশুনা তখন শুধু ভারতবর্ষে নয় সমগ্র পৃথিবীতে অতি অল্প লোকেরই ছিল। ষ্টেটস্‌ম্যানের রিপোর্টার প্রেসিডেন্সী কলেজের মানমন্দিরে গবেষণারত মেঘনাদ সাহার সাথে সাক্ষাৎ করাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে বসেই তিনি "আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের ভূমিকা" এই প্রবন্ধটি লেখেন, এবং পরদিন ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে তা ছাপা হয়। সহজবোধ্য ভাষায় আপেক্ষিকতাবাদকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার এই প্রথম প্রয়াস। এরই কিছুদিন পর সাহা ও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু একত্রে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের তথ্যবহুল প্রবন্ধগুলি জার্মানভাষা থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। এই প্রবন্ধগুলির গুরুত্ব বিবেচনা ক'রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ইংরাজী অনুবাদগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার ভার নেন।

শুধু বিজ্ঞানী হিসাবেই মেঘনাদ সাহা আমাদের কাছে পরিচিত নন। ভারতের জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রয়োজন—একথা বহুদিন থেকে তিনি প্রচার করে এসেছেন। ১৯৩৬ সালে সাইক্লোট্রনের আবিষ্কর্তা অধ্যাপক লরেন্সের গবেষণাগার পরিদর্শন করে ফিরে আসার পর তিনিই সর্বপ্রথম ভারতে আণবিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। নিদারুণ বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়ে গিয়েও তিনি জনগণের প্রয়োজনে আণবিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই জাজ্বল্যমান কীর্তির সাক্ষ্য দেয় ক'লকাতার "Institute of Nuclear Physics". একথা জোর করে বলা যায়,—"Prof. Saha was the originator of the study of 'Nuclear Physics' in India and the Institute of Nuclear Physics will always remain a monument to his creative ability and constructive genius. He was probably one of the first in the whole world in which the utilisatian of atomic power development was discussed."

প্রধানতঃ ডাঃ সাহার অক্লান্ত চেষ্টায়ই ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত Indian Association for the Cultivation of Science প্রতিষ্ঠানটি আজ এক বিরাট গবেষণাগারে রূপান্তরিত হয়েছে।

ডাঃ সাহার নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতীয় পঞ্জিকা সংস্কার সমিতি একটি নির্ভুল জাতীয় পঞ্জিকা প্রকাশ করেছেন। এই কার্যে তিনি তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং জ্যোতির্বিদ্যায় অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা আমাদের এই দেশ। কিন্তু প্লাবন এর নিত্যসহচর। এদেশের নদীগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার কোন চেষ্টাই এর আগে হয়নি। বন্যাপ্রতিরোধ-কল্পে নির্মিত আমেরিকার টেনিসি উপত্যকার বাঁধ দেখার পর অধ্যাপক সাহার দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। ১৯৪৩ সালে দামোদরের বন্যার পর অধ্যাপক সাহাই সর্বপ্রথম এ বিষয়ে নতুন পথের সন্ধান দেন তাঁর 'River-Valley Project' এর মাধ্যমে। 'দামোদরের বাঁধ-নির্মাণ' পরিকল্পনার ইতিহাসে ডাঃ সাহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর স্বাধীনতাকামী মেঘনাদ তাঁর জীবনদর্শনে বলেছেন—Nobody should suffer from hunger and privation. But for this purpose rivalry amongst nations should give way to co-

operative construction and the politician should hand over many of his functions to an international board of trained scientific economists, and eugenists, who will think in terms of the whole world as a unit."

বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক হয়েও দেশের সর্বহারা বাস্তুত্যাগীদের দুঃখমোচনের দায়িত্ব নিয়ে ও বিজ্ঞানকে দেশের সেবায় প্রয়োগ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৪২ সালে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তিনি বলেন,—Scientists are often accused of living in the 'Ivory Tower' and not troubling their minds with the realities of life. I had lived in the Ivory Tower upto 1930. But science and technics are as important for administration now-a-days as law and order. I have gradually glided into politics because I wanted to be of some use to the country in my own humble way."

১৯৫৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান হয়। তাঁর মহাপ্রয়াণে বিজ্ঞান জগতের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পড়ল। ভারতবাসী চিরকাল শ্রদ্ধানম্র চিত্তে দরিদ্রের বন্ধু এই বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীকে স্মরণ করবে।

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান,
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

—রবীন্দ্রনাথ

[বিখ্যাত বিপ্লবী সূর্য সেনের নোট-বইতে এই উক্তিটি উদ্ধৃত ছিল]

বাংলা সনেটের ক্রমবিবর্ত্তন

দীপ্তিপ্রসাদ মিত্র

চতুর্থ বর্ষ। সাহিত্য

সনেট নামটাও বিলাতী, বস্তুটিও আমাদের দেশের নয়। "সনেট" শব্দটির ব্যুৎপত্তি আলোচনা করলে দেখা যায়, ইতালীয় শব্দ "সনেটো"—যার অর্থ গীতময় মৃদুধ্বনি তার—থেকে সনেট শব্দটি এসেছে। ইতালী হ'ল সনেটের জন্মভূমি। আদি সনেট ইতালীয় ভাষায় রচিত। আদি সনেটের রচয়িতা হলেন ইতালীয় কবি পেত্রার্ক। কিন্তু, একদল সমালোচক বলেন যে, পেত্রার্কের পূর্ব্বেও দান্তে সনেট রচনা করেছিলেন। একজন বিশিষ্ট সমালোচক আদি সনেট সম্বন্ধে নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "অনেকে গ্রীক কবিতার Epigram এর সঙ্গে ইতালীয় সনেটের বিলক্ষণ মিল দেখতে পান। এবং কোন কোন প্রাচীন কবি নাকি সনেট লিখে এপিগ্রাম নামে চালিয়েছেন।" অবশ্য এ বিষয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ আছে। সে মতবিরোধের মধ্যে আমাদের যাবার কোন প্রয়োজন নেই।

এখন দেখা যাক সনেটের আঙ্গিক কিরকম হবে। সনেটের আঙ্গিক বিচার করতে গিয়ে আমাদের প্রথমে বিচার করতে হবে সনেটের বহিরঙ্গের আঙ্গিক। বাইরের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, সনেটে থাকবে ১৪ অক্ষরের ১৪টি পংক্তি। প্রথম আট লাইনকে বলা হয় অষ্টক বা Octave, আর শেষ ছয় লাইনকে বলা হয় ষট্‌ক বা Sestet. ইংরেজীতে Iambic Pentameter ছন্দই হ'ল সনেটের ছন্দ। এইবার ছন্দের মিলবিন্যাসের কথা আলোচনা করা যাক। অষ্টকের মিলবিন্যাস এইরূপ কখ খক, কখ খক। ষট্‌কের মিলবিন্যাস দু'রকম হতে পারে। প্রথমে, গঘ গঘ গঘ আবার গঘঙ গঘঙ বা গঘগ গঘগ ইত্যাদি নানাপ্রকার মিল হতে পারে। এতদ্ব্যতীত আরো কতকগুলো নিয়ম আছে। যেমন, অষ্টক ও ষট্‌কের মধ্যে পংক্তিগত যোগ থাকবে না। অষ্টকের মধ্যে যে দুটো Quatrain থাকবে তারা যুক্ত হয়ে থাকবে না। ষট্‌কের মধ্যে যে দুটো tercet থাকবে তারাও যুক্ত হয়ে থাকবে না। এই গেল সনেটের বহিরঙ্গের লক্ষণ।

কিন্তু, ১৪ লাইনই সনেটের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য নয়। যদি তা হোত, তবে যে কোন ১৪ লাইনের কবিতা সনেট হবার দাবী রাখতো। সনেটের সবচেয়ে বড়

বৈশিষ্ট্য তার দৃঢ় কাঠামো, তার ভাবগাঢ়তা, তার ঘনপিনদ্ধতা। সনেটের form টাই সবচেয়ে বড় কথা নয়, তবু formটার মধ্য দিয়ে যে সঙ্গীতরূপটি ফুটে ওঠে সেটাই উল্লেখযোগ্য। সনেটে আবেগ ও প্রশান্ত সংযমের মধ্যে হবে মিলন। সনেটের ভাষাতে কোনরকম অপরিচ্ছন্নতা, অস্পষ্টতা, বা অর্থদুরূহতা থাকবে না। সমগ্র সনেটটি হবে একটা সম্পূর্ণ ও অখণ্ড বস্তু। সনেটের ভাবে থাকবে গাম্ভীর্য। তরল ভাবের উচ্ছ্বাস সনেটের পক্ষে উপযুক্ত নয়। এইগুলোই সনেটের ভাবগত লক্ষণ। সাধারণতঃ বলা হয় যে, বাংলা কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে সনেটের প্রথম প্রবর্ত্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কিন্তু, অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু তার "চর্যাপদ" গ্রন্থের ভূমিকাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন, "মাইকেল এদেশে সর্ব্বপ্রথম চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনার রীতি প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণই যুক্তিহীন। তাহার পূর্ব্বে কি এদেশে চৌদ্দ পদের কোন কবিতাই রচিত হয় নি? বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চৌদ্দপদী কবিতার অভাব নেই। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এই জাতীয় কবিতার প্রবর্ত্তক হিসেবে মাইকেলকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না"। অধ্যাপক বসু মহাশয়ের বক্তব্যের সারবত্তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে, আমরা বলবো যে, ১৪ অক্ষর এবং ১৪ লাইন সনেটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হতে পারে, কিন্তু একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। ১৪ অক্ষর এবং ১৪ লাইনের কবিতা হলেই সনেট হবে না। আরো কতকগুলো লক্ষণ সনেটের আছে। সেই লক্ষণগুলো নিয়ে পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে আমরা আলোচনা করেছি। চর্যাপদের ১০ এবং ১৫ সংখ্যক চর্যা চৌদ্দ পঙ্‌ক্তির এবং বৈষ্ণব পদাবলীতেও চৌদ্দ পঙ্‌ক্তির অনেক কবিতা থাকতে পারে। এসব কথা অবশ্য আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু, সনেটের বহিরঙ্গের ও অন্তরঙ্গের যে আঙ্গিক, তার প্রধান লক্ষণের সঙ্গে, প্রাক্-মাইকেল যুগের কোন কবিতা মিলে গেলে সেই কবিতাকে অতি অবশ্যই আমরা সনেট বলবো। কেবল চৌদ্দ পঙ্‌ক্তির কবিতা হলেই তাকে সনেট বলা যায় না।

মাইকেল মধুসূদন দত্তকেই এখনও অবধি আমরা বাংলা কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে সনেটের প্রথম প্রবর্ত্তক বলে স্বীকার করে থাকি। মাইকেল তার সনেটগুলো রচনা করেন তার জীবনের শেষভাগে। তিনি যখন তার অমর মহাকাব্য "মেঘনাদ বধ" রচনাতে ব্যাপৃত ছিলেন তখনই সনেট রচনার পরিকল্পনা তার মনে আসে। তারপর তিনি "কবি-মাতৃভাষা" নামে একটা সনেট রচনা করেন। এটি বাংলা ভাষার প্রথম

সনেট। এই সনেটটি পরে কিছুটা সংস্কৃত হয়ে "বঙ্গভাষা" নামে পরিচিত হয়। মাইকেল যখন ভার্সাই নগরে ছিলেন তখন তিনি প্রায় শতাধিক সনেট রচনা করেন। মাইকেল classical সনেটের আদর্শে বাংলাভাষায় সনেট রচনা করেন। কিন্তু তার সনেটগুলো রসোত্তীর্ণ হয় নি। তিনি তার সনেটগুলোর নাম সনেট না দিয়ে চতুর্দ্দশপদী দিলেন কেন? সনেটের যথার্থ প্রতিশব্দ চতুর্দ্দশপদী নয়। কারণ এই প্রতিশব্দের মধ্য দিয়ে সনেটের বহিরঙ্গের পরিচয়টি ফুটে উঠেছে, কিন্তু সনেটের যেটা মর্ম্মগত লক্ষণ সেটা ফুটে উঠে নি। কিন্তু এ কথাটা মনে রাখা দরকার যে, গভীরভাবে বিচার ক'রে দেখা যায়, মাইকেলের সনেটগুলো চতুর্দ্দশপদীই হয়েছে, ঠিক সনেট হয় নি। সনেটের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তার ভাবগাঢ়তা, তার দৃঢ় কাঠামো এবং ঘনপিনদ্ধতা। কিন্তু মাইকেলের প্রতিভা ছিল ঊর্মিমুখর। এই ঊর্মিমুখর প্রতিভা সনেটের দৃঢ় কাঠামো আর সংযমশাসিত আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেনি, দু'কুল ছাপিয়ে পড়েছে। মাইকেল বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে সনেটের প্রবর্ত্তক হতে পারেন, কিন্তু সার্থক সনেট-রচয়িতা নন। পথিকৃৎ হলেই সব সময় বড় স্রষ্টা হওয়া যায় না। কিন্তু মাইকেলের সনেটের আরো কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। মাইকেলের সনেটগুলোকে বলা হয় "বিদেশী ফ্রেমে বাঁধানো দেশী ছবি"। তার অর্থ, এই সনেটগুলোর মধ্য দিয়ে মাইকেলের স্বদেশপ্রেম ও তার বাঙ্গালীয়ানার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তার অন্তরের ছিল নিবিড় সংযোগ। ইউরোপীয় ভাব ও ভাষার সঙ্গে তার ছিল গভীর পরিচয়। কিন্তু তার মনটা ছিল খাঁটি বাঙ্গালীর। এই খাঁটি বাঙ্গালী মনের প্রকাশ ঘটেছে তার সনেটগুলোর মধ্য দিয়ে।

মাইকেলের পর যারা সনেট রচনাতে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি অনেকগুলো সনেট রচনা করেছেন। তার "নৈবেদ্য" কাব্যে বহু সনেট রয়েছে। কিন্তু যথার্থভাবে বিচারে দেখা যায় যে, তার খুব কম সনেটই সার্থক সনেট হয়েছে। অবশ্য এই বিচারটা করা হয় classical সনেটের মানদণ্ডে। যাই হোক না কেন, এ কথা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না যে, তিনি সনেট রচনার ক্ষেত্রে পূর্ব্বাপেক্ষা নূতনত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৪ মাত্রার এবং ১৮ মাত্রার—দুই প্রকারের সনেটই রচনা করেছিলেন। তিনি তার সনেটগুলোতে দুই দুই চরণে মিল দিয়েছেন। সনেট রচনার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে যাঁরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের

মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেবেন্দ্রনাথ সেনের সনেটে ইতালীয় এবং রোমান্টিক এই উভয়প্রকার রচনারীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর বেশীর ভাগ সনেট ছিল মুক্তবন্ধ। তাঁর বহু সনেটের শেষ দুই পংক্তিতে রোমান্টিক সনেটের মতো "Rhymed couplet ending" দেখা যায়। দেবেন্দ্রনাথ বহু সনেট রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর সব সনেটই যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে এ কথা বলা যায় না। বাংলা সনেটের ইতিহাসে প্রমথ চৌধুরীর একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। তিনি প্রচলিত পদ্ধতিতে সনেট রচনা না করে নূতন এক রীতিতে সনেট রচনা করেন। তিনি ফরাসী রীতিতে সনেট রচনা করেছেন, ইতালীয় বা ইংরাজী সনেট রচনারীতি অনুসরণ করেন নি। প্রমথ চৌধুরীর সনেটগুলোর মধ্যে ভাব গভীরতা নেই, আছে পরিহাস রসিকতা ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ। প্রমথ চৌধুরীর রচনার যা বৈশিষ্ট্য, মননশীলতা, বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা, শ্লেষাত্মক মন্তব্য,—এগুলো কোনটাই তাঁর সনেটে বিরল নয়। তাঁর বেশীর ভাগ সনেটই রয়েছে তাঁর "সনেট পঞ্চাশৎ" পুস্তকে। সার্থক সনেট রচনাতে মোহিতলাল বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি অনেকগুলি ১৮ মাত্রার সনেটও রচনা করেছেন।

আধুনিক বাংলা কবিতার ধারাটা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সনেটের স্থান ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। সনেট ঠিক বাঙ্গালীর প্রতিভার উপযোগী নয়। বাঙ্গালীর প্রতিভা মূলতঃ গীতিধর্ম্মী; উচ্ছ্বাস-মুখর। সনেটের দৃঢ় কাঠামোর মধ্যে এই উচ্ছ্বাসমুখর প্রতিভা আবদ্ধ থাকতে চায় না। তাই বাঙ্গালী কবিরা সাধারণতঃ সনেট রচনা করতে চান না; করলেও খুব কম সময়েই সেগুলো সার্থক সনেট বলে পরিগণিত হয়। আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সনেটের স্থান খুব উল্লেখযোগ্য নয়। খুব কম সংখ্যক আধুনিক কবিই সনেট রচনা করেন। কারণ সনেটের আঙ্গিক ও রচনারীতি বাঙ্গালী প্রকৃতির ধর্মবিরুদ্ধ। এই সব দিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয় যে, বাংলা সনেটের ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ নয়।

স্বদেশপ্রেমিক শ্রীমধুসূদন

শ্রীঅসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় বর্ষ। সাহিত্য

মধুসূদন উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি, এবং জয়দেবের পর বঙ্গভূমির শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা। ইহা আমার ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাস নহে। বাঙ্গালীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যে আদি ও শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিককে আকুল করিয়াছিল, নিদ্রায় ও জাগরণে স্বদেশ-চিন্তা ব্যতীত যাঁহার অন্য চিন্তা ছিল না, সেই ভাবুক-মনীষী ঋষি বঙ্কিম স্বয়ং মধুসূদন সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "এই প্রাচীন দেশে দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষের কথা বিবাদের স্থল—নিশ্চয়স্থল হইলেও শ্রীহর্ষ বাঙালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।"

তিনি যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাহায্যে বঙ্গভাষায় নব নব কাব্যের সুরধুনীকে আনিয়াছিলেন শুধু তাই নয়, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার আর একটি অভিনব অবদান হইতেছে "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"। বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, কবি মধুসূদনই বঙ্গসাহিত্যের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ Sonneteer (সনেট রচয়িতা)।

হিন্দুধর্মের প্রতি বিরাগবশতঃ মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে মধুসূদন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ধর্ম ছাড়িলেও তিনি জীবনে মুহূর্তের জন্যেও দেশ বা দেশবাসীকে ভুলিয়া যান নাই। তিনি এমন যুগে শিক্ষিত হইয়াছিলেন যখন গুটিকতক নব্য যুবক ইংরাজী শিখিয়া পুরোদস্তুর সাহেব বলিয়া দেশের প্রতি নাক সিটকাইতে লাগিল, এবং স্বদেশের সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সব কিছুকেই পাশ্চাত্যের তুলনায় হীন প্রতিপন্ন করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। মধুসূদনও এই যুগেরই ছেলে। পুরোদস্তুর সাহেব বনিবার কল্পনা তাঁহার মনে চিরকালই ছিল, কিন্তু অন্তরে ছিলেন তিনি স্বদেশপ্রেমিক এক বাঙালী সন্তান। পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁহার উদার দৃষ্টিভঙ্গিকে কখনও আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। বরং ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, তাঁহার মত মহাগুভব স্বদেশপ্রেমিক উনবিংশ শতাব্দীতে কেন, বিংশ শতাব্দীতেও দুর্লভ। এখন আমরা তাঁহার কাব্য সমূহ হইতে তাঁহার গভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করিব।

মধুসূদন স্বদেশের মাটিকে বড় ভালবাসিতেন। তাই যেখানেই থাকুন না কেন

স্বদেশের তরুলতা, পশুপাখী, নদনদীর কথা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই। 'পরিচয়' কবিতাটিতে আমরা ভারতের শাশ্বত রূপটি দেখিয়া মুগ্ধ হই। দেশকে গভীরভাবে ভালবাসা এবং উপলব্ধি করার ক্ষমতা না থাকিলে এইরূপ চিত্র অঙ্কন করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। কবিতাটির প্রতি ছত্র যেন ভারতমাতার চিরসুন্দর সনাতন রূপটিকে পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছে। তাই গভীর সহানুভূতির সহিত কবিকে বলিতে শুনি—

"যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে,
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী; যে দেশে ভেদি বারিদ-মণ্ডলে
(তুষারে বপিত বাস ঊর্দ্ধ কলেবরে,
রজতের উপবীত স্রোতঃ-রূপে গলে,)
শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ,"........

এ হেন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া কবি নিজেকে অসীম সৌভাগ্যশালী মনে করিতেছেন। এই অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া কবি ধন্য—

সে দেশে জনম মম; জননী ভারতী;
তেঁই প্রেম-দাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে!"

কবির অমর সৃষ্টি 'কপোতাক্ষ নদ' তাঁহার স্বদেশপ্রীতির আর একটি জলন্ত উদাহরণ। কবির জন্মভূমি সাগরদাঁড়ি গ্রাম এই নদের পার্শ্বেই অবস্থিত। ছেলে বেলায় ইহার তীরে বসিয়া কবি কত খেলা করিয়া কাটাইয়াছেন, এই নদের কুলকুল ধ্বনি শুনিতে শুনিতে তিনি হয়ত ঘুমাইয়া পড়িতেন। বোধ হয় এই নদ পরবর্তী জীবনে তাঁহার মধ্যে কবি-প্রতিভার উন্মেষণে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিল। কবির বহু চিঠি পত্রে এই নদের উল্লেখ আমরা পাই। বাস্তবিক কবির জীবনে এই নদের প্রভাব গুরুতর। বিদেশে যখন কবি-চিত্ত স্বদেশের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন বার বার তাঁহার মনে এই নদের স্মৃতিরই জাগরণ হইতে লাগিল। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কবি-মন যতই নিরাশায় ভরিয়া যাইতে লাগিল, ততই বাল্যকালের সঙ্গী সেই নদ তাঁহার স্মৃতি পটে দেখা দিতে লাগিল—

"সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!"—

কবি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বহু নদ নদীই দেখিয়াছেন, কিন্তু অন্তরের পিপাসা কি তাহাতে মিটিতে পারে? শৈশব স্মৃতি বিজড়িত সেই নদের সুমধুর কলধ্বনি কি ভুলা যায়? তাঁহার নিকট ইহা ত—

"দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে!"

শেষ ছয়টি চরণে কবি-অন্তরের গভীর ব্যাকুলতাই প্রকাশ পাইয়াছে—

"আর কি হে হবে দেখা?—যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি। এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে নাম তব বঙ্গের সঙ্গীতে!"

সাগরদাঁড়িতে এই নদের তীরে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রস্তর ফলক আজ পর্য্যন্ত কবির এই কবিতাটিকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

সুদূর বিদেশে বসিয়াও ভারতবর্ষের কথা কবির সর্বদা মনে পড়িত। তাঁহার কবি চিত্ত তৎকালীন ভারতের দুর্দশা দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল। 'ভারতভূমি' কবিতাটি আমাদের মনে হয় এক এক বিন্দু অশ্রুমুক্তার মাল্য। ইটালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি Filicaia একদিন যেমন করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন—

"Italia! Italia! O tu cui feo la sorte
Dono infelice helleza!"
"কুক্ষণে তোরে লো, হায়, ইতালি! ইতালি!
এ দুখ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি!"—(মধুসূদনকৃত অনুবাদ)

ঠিক তেমনি ভাবেই কবি যেন ভারতের দুঃখ দৈন্য দেখিয়া ক্রন্দন করিতেছেন—

"হায় লো ভারতভূমি! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ নয়নি,
বিধাতা!"

তিনি জানেন ভারতের দুর্বলতার জন্যই সে বার বার বিদেশীর নিকট বন্দিনী হইয়াছে, বহিঃশত্রু বারে বারে ভারতকে আক্রমণ করিয়া ভিখারিণী করিয়া তুলিয়াছে, দীপ্ত স্বদেশপ্রেমিক কবি তাই ভারতমাতাকে সাপিনীর মতো বিষময়ী হইতে বলিতেছেন। তাহা হইলে বিদেশী শত্রু পুনর্বার তাহার সোনার অঙ্গ ছাই করিতে সাহস করিবে না। তাই তাঁহাকে বলিতে শুনি—

> "রহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী,
> রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি,
> *　*　*　*　*
> (হা বিক!)

'আমরা' কবিতাটি 'ভারতভূমি' কবিতাটিরই আরও পূর্ণাঙ্গরূপ বলিয়া মনে হয়। মধুসূদনের পূর্বে আর কেহই ভারতের দুঃখ গ্লানির কথা এমন করুণভাবে গাহিতে পারেন নাই। যে ভারতবর্ষ এককালে সর্ববিষয়ে জগতের গুরুর পদে বৃত হইয়াছিল তাহার আজ একি দুর্দশা—

> "আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
> নির্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে,
> তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে?—
> আমরা,—দুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
> পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে?—"

কি হেতু ভারতের জ্যোতিঃরূপ গৌরব নিবিয়া গেল? কোন পাপে আজ সে সিংহের সন্তান হইয়াও শৃগালের মত বিদেশীর পদানত? কবি জানেন, ইহা নিয়তি ভিন্ন কিছুই নহে। তাই তিনি মহাকালকে প্রশ্ন করিতেছেন—

> "রে কাল, পূরিবি কিরে পুন নব রসে
> রস-শূন্য দেহ তুই? অমৃত-আসারে
> চেতাইবি মৃতকল্পে? পুনঃ কি হরষে,
> শুক্লে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে?"

এই খানেই আমাদের মনে হয় কবি আশা-বাদী। দুঃখ, দৈন্যকে তিনি মানিলেও ভবিষ্যতের সুখ সমৃদ্ধির কল্পনা তিনি কখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থির বিশ্বাস ভারত পুনরায় তাহার নিজ গৌরবে সংসারে দীপ্তি পাইবে। ভবিষ্যত অন্ধকারেও তাঁহার মনে আশার দীপ জ্বলে। 'চতুর্দশ-পদী কবিতাবলীর' শেষ কবিতা 'সমাপ্তে' মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ সনেট্। এই কবিতায় একদিকে যেমন গভীর দুঃখের মূর্ছনা গীতি শুনা যায়, অন্যদিকে তেমন একটি আশার ধ্বনিও আমাদের

কর্ণে বাজিয়া উঠে। কবির দেশভক্তি ও কাব্য সাধনার ইহাই শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণতম নিদর্শন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেছেন তাঁহার দীনতা ও তাঁহার লুপ্তপ্রায় প্রতিভার কথা। এই intellectual bankruptcy'র জন্য তাই তাঁহাকে আক্ষেপ করিয়া বলিতে শুনি—

"বিসর্জিব আজি, মাগো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয় মণ্ডপ হায় অন্ধকার করি।)
ও প্রতিমা। নিবাইল দেখ হোমানলে
মনঃ-কুণ্ডে অশ্রুধারা মনো দুঃখে ঝরি।
শুখাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বিস্মরি
সংসারের ধর্ম, কর্ম। ডুবিল সে তরি,
কাব্য-নদে খেলাইনু যাহে পদ-বলে
অল্প দিন। নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে,
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে?)
এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে!"

ইহার শেষ দুইটি ছত্র বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়। অন্য কোন কবি ইহার চেয়ে আন্তরিকতা দেখাইতে পারেন নাই—

"এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে!"

মধুসূদনের আর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতার উল্লেখ করিয়া এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করিব। বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে তিনি 'বঙ্গভূমির প্রতি' নামক এই অমর কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন। কি গভীর স্বদেশ অনুরাগের ভাব হৃদয়ে পোষণ করিলে এমন কবিতা রচনা করা যাইতে পারে, তাহা যিনি এই কবিতাটি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানেন। এখানে আর সেই দেশজননীর অভিমানী বিদ্রোহী দুর্দান্ত সন্তানের পরিচয় পাই না, পাই শুধু মাতৃভূমির প্রতি সেই সন্তানের গভীর ও ঐকান্তিক ভালবাসার—

"রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।

প্রবাসের দৈবের বশে,
জীবতারা যদি খসে
এ দেহ আকাশ হতে,—নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে
নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে!"

বঙ্গের এই শ্রেষ্ঠ কবি, এই অসাধারণ স্বদেশপ্রেমিকের মৃত্যুর পর হেমচন্দ্র যে অতুলনীয় শোকগাঁথাটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার চারিটি ছত্রের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধটি সমাপ্ত করিলাম—

"সাহিত্য কুসুম প্রমত্ত মধুপ,
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি,
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার,
শ্রীমধুসূদন কবি।"

হে ভারত, ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, ··· সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই·····ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমার মনুষ্যত্ব দাও; মা, ····· আমায় মানুষ কর।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

ভ্রমণকাহিনী

কাশ্মীর ভ্রমণ

শ্রীসূর্য্যকান্ত দত্ত
প্রথম বর্ষ। বিজ্ঞান

১৯৫৫ সালের মে মাস। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা অনেক দিন হল শেষ হয়েছে। এখন আমার অফুরন্ত অবসর।

এদিকে ক'লকাতার তাপমাত্রা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। মাথার উপরে নিদাঘের রৌদ্র-দগ্ধ আকাশ সারাদিন অনল বর্ষণ করছে। নগরের রাজপথগুলি যেন জরক্লিষ্ট মানুষের নাড়ীর মত দব দব করছে। রাস্তার দু'পাশের বাড়ীগুলির একঘেয়ে ধূসর পাণ্ডু বর্ণ দেখে চোখ জ্বালা করছে। এই অবস্থায় এই শ্রীহীন দগ্ধ মৃত্তিকা স্তূপের অভ্যন্তরে বসে এই অলস কর্ম্মহীন তন্দ্রারসে ভরা জীবন যেন অসহনীয় বোধ হচ্ছে। বার বার যুধিষ্ঠিরের সেই বার্তার কথা মনে হচ্ছে : মহাকাল একটা বিরাট কটাহে রাত্রিদিন ইন্ধন দিয়ে এই জীবগুলিকে রন্ধন করছেন! এই অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মনটা ছট্‌ফট্ করছে।

এমন সময় এল সুদূরের আহ্বান। এই সুদূরকে চিরকাল আমি আমার আপন মনের মাধুরী দিয়ে রচনা করেছি। এক তীর্থযাত্রীর দল দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যাচ্ছেন; জ্যেঠামশাই বললেন, আমি ইচ্ছা করলে তাঁদের সঙ্গে যেতে পারি। পিঞ্জরে বাঁধা বিহঙ্গ যেমন উন্মুক্ত নীল আকাশে উড়ে বেড়াবার আনন্দে মেতে ওঠে, তেমনি আমার মনেও সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও কন্যাকুমারিকার ধ্যান জেগে উঠল। এই সেই রামেশ্বর যেখানে একদিন শ্রীরামচন্দ্রের নির্মিত সেতুদ্বারা মলয় পর্বত পর্যন্ত সাগরের ফেনিল অম্বুরাশি বিভক্ত হয়ে—ছায়া পথের দ্বারা খণ্ডিত শরতের নক্ষত্র-খচিত আকাশের মত দেখাচ্ছিল। একটা অনাস্বাদিত আনন্দে আমার মন মেতে উঠল।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। এর কয়েকদিন পরেই দূরাগত ভৈরবের মহাসঙ্গীতের মত শুনতে পেলাম দেবতাত্মা হিমালয়ের অমোঘ আহ্বান। কাকা বললেন, 'চল, তোমাকে নিয়ে কাশ্মীর বেড়াতে যাব।' উভয়সঙ্কটে পড়ে গেলাম। দুইদিকে নয়নাভিরাম শ্যামল তৃণ সাজিয়ে মাঝখানে একটি গাধাকে বেঁধে দিলে,

কোন দিকের তৃণ সে আগে খাবে এই ভেবে তার অবস্থা যেমন করুণ হয়ে ওঠে, আমারও তেমনি ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। দাক্ষিণাত্যে গেলে কাশ্মীর দেখা হয় না; ভূস্বর্গের সেই অপূর্ব সুষমা চক্ষুর অগোচরেই থেকে যায়। কাশ্মীর গেলে বিচিত্র বর্ণের শুক্তি ও উপলখণ্ডে আকীর্ণ সমুদ্রসৈকত দেখা হয় না। কাঞ্চী, মহাবলীপুরম্, মাদুরা ও ত্রিচিনাপল্লীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মন্দির দেখা হয় না। দেখা হয় না কন্যাকুমারীর স্বপ্নময় মায়াময় অপূর্বরূপশ্রী। অবশেষে দাক্ষিণাত্যের স্বপ্নছবি হৃদয়ের মণিকোঠায় তুলে রেখে কাশ্মীরের পথেই পাড়ি দিলাম।

নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্রের একটা চিরন্তন আকর্ষণ আছে; তাহা মনকে অনবরত টানে। কিন্তু হিমালয় মনকে টেনেই ক্ষান্ত হয় না, একেবারে টেনে নিয়ে যায়। হিমালয়ের ডাক, হিমালয়ের আকর্ষণ এমনি দুর্নিবার।

১৯শে মে হাওড়া হতে সন্ধ্যায় অমৃতসর মেলে আমরা কাশ্মীর রওনা হলাম। ট্রেন যখন ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাচ্ছিল তখন মনের মধ্যে সে কি আনন্দ ও উত্তেজনা! কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই বিরাট লৌহ দানব অন্ধকারের বুক চিরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চল্‌ল। আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ছায়াপথ দেখা যাচ্ছে। কে জানে, মহাকালের কোন রহস্যময় ইঙ্গিত তারা অনন্তকাল ধরে বহন করছে। দু'পাশে গ্রামের দৃশ্য অন্ধকারে এক হয়ে একটা রহস্যের যবনিকার মত মনে হচ্ছে। পরদিন আমাদের গাড়ী বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মধ্য দিয়ে চলল। এই দুই প্রদেশের পল্লী অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার মধ্যে যেন একটা বেশ শান্তরস বিরাজ করছে। এই ভ্রমণ উপলক্ষে এদের সঙ্গে যেন একটা নিবিড় পরিচয় ও আত্মীয়তার যোগসূত্র স্থাপিত হল। উত্তরপ্রদেশের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার দুপাশে দেখি, মাইলের পর মাইল চলেছে ল্যাংড়া আমের গাছ, তাতে অসংখ্য পাকা আম ঝুলে রয়েছে। দেখে বেশ লোভ হচ্ছিল।

২২শে মে সকাল প্রায় ১১॥টায় আমরা অমৃতসরে পৌছলাম; রাস্তার ধকলে ও অসহ্য গরমে আমাদের দেহমন তখন শ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে। ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে বেশ করে স্নান সেরে পেট ভরে খেয়ে সহর দেখতে বেরুলাম। প্রথম আমরা বিখ্যাত স্বর্ণমন্দিরে গেলাম। ওখানকার নিয়ম অনুযায়ী আমরা খালি পায়ে মাথা রুমাল দিয়ে আচ্ছাদিত করে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। এত লোকের ভীড়, অথচ এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই কোথাও। ঢুকেই দেখলাম, কয়েকজন ভক্ত ভজন গান করছেন। আমরা প্রসাদ খেলাম। একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আমাদের সব ঘুরিয়ে

দেখালেন। সমস্ত মন্দিরটা ঘিরে বিরাজ করছে একটা শান্ত, স্নিগ্ধ, সৌম্য পরিবেশ। চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাছেই একটা ধর্মশালা; সেখানে যে কোন ধর্মাবলম্বী বিনে পয়সায় এক সপ্তাহ থাকার সুবিধা পায়।

এরপর ঐতিহাসিক জালিয়ানওয়ালাবাগ রওনা হলাম। প্রবেশ পথে একটি ছোট্ট দরজা। একটু এগিয়েই গোল গোল সিঁড়ি, লেখা রয়েছে সেখানেই মেসিনগান বসিয়ে জেনারেল ডায়ার শত শত নিরস্ত্র নিরপরাধ ব্যক্তিকে অসভ্য বর্বরের মত গুলি করতে আদেশ দিয়েছিল। স্থানটিকে বাগানের মত করে সাজান হয়েছে। প্রাচীর গাত্রে অনেকগুলি বুলেটের চিহ্ন সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাক্ষ্যস্বরূপ অতি যত্নে রক্ষিত আছে। বাগানটি ঘিরে সেই বীভৎস হত্যালীলায় ব্যথিত দেশবাসীর পুঞ্জীভূত বেদনা ও হাহাকার যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। সময় আর না থাকায় ষ্টেশনের দিকে ফিরে চললাম। সবাই নীরব; দেখে মনে হল, সকলের মনই যেন সেই সকরুণ অতীত স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত।

সেই দিনই চারটার ট্রেণে রওনা হ'য়ে সন্ধ্যায় আমরা পাঠানকোটে পৌছলাম। পরের দিন বাসে শ্রীনগর অভিমুখে রওনা হলাম। পথে কুদে টিফিন ও জম্মুতে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে, রাতটা বানিহালে কাটিয়ে, তারপর দিন দশটা নাগাদ শ্রীনগরে পৌছলাম। হোটেলে থাকার জায়গা আমাদের ঠিক ছিল; আমরা সেখানেই উঠলাম। শ্রীনগরে ঝিলাম নদীতে ও ডাল হ্রদে বোটেও থাকা যায়।

সেদিন পুরো বিশ্রাম নিয়ে পরদিন আমরা শহর দেখবার জন্য বের হলাম। ছোট্ট শহর। একদিকে হরিপর্বত, অপর দিকে তখত্-ই-সুলেমান। চারিদিকে শুভ্র পর্বতমালা। উত্তর দিকে দাঁড়িয়ে আছেন নগাধিরাজ হিমালয় তাঁর চিরশুভ্র, উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ তুলে। তারই নীচে অসংখ্য ঝাউ গাছ হিমালয়ের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে। শহরটার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে ঝিলাম নদী। ছয় সাতটি সেতু আছে এই নদীটির ওপর। এক হাজার ফুট ওপরে শঙ্করাচার্য্যের মন্দির অবস্থিত। জামা মস্‌জিদ এখানকার সর্ববৃহৎ মস্‌জিদ।

রবিবার কাশ্মীরের বিখ্যাত মোগল-বাগানগুলি খোলা থাকে। একটা টাঙ্গা ভাড়া করে আমরা বাগান দেখতে বেরুলাম।

প্রথমেই রাস্তার কিছু উপরে রয়েছে চশমাশাহী; মোগলদের দ্বারা নির্মিত বাগানগুলির মধ্যে এটি ক্ষুদ্রতম। এখানকার জল স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। আমি একটু পেটরোগা মানুষ, তাই পেট ভরে জল খেয়ে নিলাম। এরপর গেলাম শালিমার। বাংলা

অর্থ প্রেম-নিকেতন। চারিদিকে ফুল আর ফোয়ারার সমারোহ। উদ্যানের মাঝখানে একটা প্যাভিলিয়ান; তারই চতুর্দিকে ফোয়ারা। কাছেই দুজন শিল্পী ছবি আঁকতে বসে গেছেন। সেখান থেকে মাইল দুই দূরে নিশাতবাগ—বাংলা অর্থ প্রমোদ-উদ্যান। এখান থেকে ডাল হ্রদের দৃশ্য সত্যই মনোরম। শ্রীনগর থেকে আট মাইলের পথ। মোগল-বাগানগুলির মধ্যে এইটিই সর্ববৃহৎ। শুনলাম, জাহাঙ্গিরের প্রধান মন্ত্রী নাকি এর নির্মাণকর্তা। বিরাট ব্যাপার। প্রায় মাইল দুই দীর্ঘ। এখানে ফুল, ফোয়ারা ও জলের বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পেয়েছে নানা ভাবে। যে যেমনটি চায় সে ঠিক তেমনটি পাবে এই উদ্যানে। শিল্পীদের কথা বাদ দিয়েই বলা চলে যে, কোন লোকই এর সৌন্দর্যকে অস্বীকার করতে পারবে না। এ কথা সমগ্র কাশ্মীর সম্পর্কেই প্রযোজ্য। যে কোন শ্রেণীর লোকই নিঃসন্দেহে এখানে নিজেকে মানিয়ে নেবার সুযোগ পাবেন। এর পর নাসিমবাগ—বাংলা অর্থ—হাওয়া বাগান। এখানে ফুল ও ফোয়ারার প্রাচুর্য না থাকলেও চেনার গাছের সমাবেশ এখানকার আবহাওয়া বেশ উপভোগ্য করে তুলেছে।

পরদিন আমরা শ্রীনগর থেকে ২৯ মাইল দূরে (উত্তরে) গুলমার্গে রওনা হলাম। টানমার্গ পর্যন্ত বাস চলে। তারপর থেকে শুরু হয় পাহাড়ী পথ। আমরা ঘোড়ায় রওনা হলাম। পথে বেশ কুয়াশা হল। কিছুক্ষণ পরেই বৃষ্টি নামল। পাহাড়ী পথে মাঝে মাঝে ঘোড়ার পা পিছলে যাচ্ছিল। এত প্রচণ্ড শীত পড়েছে যে, শীতে আমরা সব ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম। সবাই অল্পবিস্তর বৃষ্টিতে ভিজলাম।

ঘন্টা দু'য়েকের মধ্যে হোটেলে এসে পৌছলাম। হোটেলে ঢুকেই একেবারে চুল্লীর সামনে বসে পড়লাম। বৃষ্টি খুব বেশী না থাকলেও ঝির ঝির করে বৃষ্টি হচ্ছিল। কুয়াশায় চারিদিক ঢেকে গিয়েছিল। সেদিন আর বেরুনো সম্ভব হল না। বারান্দায় বসে কাকাদের স্বদেশী আমলের গল্প শুনেই সে দিনটা কাটিয়ে দিলাম। সন্ধ্যা হতে না হতেই কোট সোয়েটার সমেত লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। সারা সন্ধ্যা মাঝে মাঝে চা খেয়ে নিজেকে গরম রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলাম।

পরদিন এক অদ্ভুত দিন। সকলকে অবাক করে চোখের সামনে উদ্ভাসিত হল আর এক অপরূপ দৃশ্য। সূর্যদেব পূর্বদিকে উঠলেন; পৃথিবী আলোয় ঝলমল করে উঠল। এই আলোকের বসন পরে প্রকৃতি দেবী যেন নিজেকে এক অপরূপ সাজে সাজিয়ে তুলেছেন। শুচিস্মিত প্রসন্ন বদনে তিনি আগন্তুকদের অভিনন্দন জানালেন। চারিদিকে শুভ্র পর্বতমালা; সূর্যদেব যেন তাদের গায়ে রংয়ের তুলিকা বুলিয়ে দিয়েছেন; কোথাও লাল, কোথাও পাংশুবর্ণ। তার উপর কাউগাছের সমাবেশ

দেখে মনে হয়, যেন তুষার শৈলের সৌন্দর্য বাড়াবার জন্যই এরা দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে বিস্তৃত শ্যামল তৃণভূমি। পাশ্চাত্যের আগন্তুকেরা সেখানে খেলায় মেতে উঠেছে। এখানকার গলফ্ খেলার মাঠ প্রাচ্যখণ্ডে অতুলনীয়।

সকালবেলা চা, ডিম ইত্যাদি খেয়ে ঘোড়ায় চড়ে সার্কুলার রোডে বেড়াতে গেলাম। রাস্তাটি প্রায় পাঁচ ছয় মাইল লম্বা হবে। এখান থেকে নাঙ্গা পর্বতের দৃশ্য জীবনে ভুলবার নয়। তারই নীচে বিশাল উপত্যকা। এই দৃশ্য দেখে বার বার সমুদ্রদর্শনে নবকুমারের সেই উচ্ছ্বাসের কথা মনে পড়ল: 'আহা! কী দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না!'

পরদিন খিলিনমার্গে রওনা হ'লাম। গুলমার্গ থেকে চার মাইল চড়াই ভেঙ্গে যেতে হয়। পথের দুপাশে নানাবর্ণের অসংখ্য ছোট ছোট ফুল গইয়ের মত ফুটে রয়েছে; সাদা, বেগুনে, লাল। মনে হল, কে যেন লাজ বর্ষণ করে গেছে। গাঢ় নীল আকাশের নীচে সেই তুষারকিরীটী অদ্রিশৃঙ্গের শ্বেতশুভ্র অনবদ্য নিশ্চল মূর্ত্তি দেখে বার বার দেবদেব ধূর্জ্জটীর ধ্যানভগ্ন রূপের কথা মনে পড়ল। মাঝে মাঝে পথের আসে পাশে পড়ে রয়েছে বরফের স্তূপ। খিলিনমার্গে গিয়ে একটু চা খেলাম। একটু অগ্রসর হতেই বরফের পাহাড় আরম্ভ হ'ল। আমরা তার উপর খানিকটা হেঁটে আবার ফিরে এলাম। তৃণভূমির এদিকে ওদিকে বহু বরফের চাপ পড়েছিল। বরফ হাতে নিয়ে দেখলাম বরফগুলি জমাট বাধা নয়, কুচি-কুচি করা। ক'লকাতার মত বরফটা তত ঠাণ্ডা বোধ হল না। একটা বরফের চাপের কাছে এসে বসলাম। একটু পরে ঘন কুয়াশা এসে আমাদের ঘিরে ধরল; কাছের মানুষকেও ভাল করে চেনা যাচ্ছিল না। দশ-পনর মিনিট পড়েই আবার সব পরিষ্কার হয়ে গেল; সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

চা খেতে খেতে মনে পড়ল জ্যেঠামশাইয়ের কথা। কোথায় তিনি আর তাঁর সঙ্গীরা, আর কোথায় আমি আর আমার সহযাত্রীরা। তিনি হয়তো এখন বসে আছেন ঊর্ম্মিমুখর সমুদ্রতীরে, আর আমি রয়েছি নগাধিরাজ হিমালয়ের সানুদেশে। একজন সমুদ্রের বেলাভূমিতে বসে আছেন সমুদ্রে জলে পা ডুবিয়ে। আর হয়তো ভাবছেন সেই পুরাকালের রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা। হয়তো তারই সাক্ষ্য খুঁজছেন বসে বসে, আর শুনছেন সমুদ্রের নিরবচ্ছিন্ন জলকল্লোল। সৃষ্টির আদিযুগ থেকে এই তরঙ্গমালা অশান্ত আবেগে বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে। আর আমি? শিশির-ভিজা মাটির উপর বসে, বরফের চাপের পাশে পা রেখে ভাবছি কয়েকবৎসর আগেকার

কাশ্মীর যুদ্ধের কথা; কাশ্মীরবাসীর ভবিষ্যতের কথা। তারই সঙ্গে উপভোগ করছি হিমালয়ের নানা খেলা। দেখছি প্রকৃতির লীলা বৈচিত্র্য। একজন অসহ্য গরমে সমুদ্রসৈকতে শরীর এলিয়ে পড়ে আছেন, আর আমি গেঞ্জির ওপরেই পাঁচ ছয়টা গরমজামা চাপিয়েও শীতে কাঁপছি, আর পেয়ালার পর পেয়ালা চা গলাধঃকরণ করে নিজেকে গরম রাখবার চেষ্টা করছি। ভাবতেও কেমন আশ্চর্য্য মনে হয়। একই ভারতের কী বিচিত্র রূপ! আরও ঘণ্টাখানেক সেখানে কাটিয়ে আমরা গুলমার্গে ফিরে এলাম। পরদিন সকালে শ্রীনগরে ফিরলাম।

২৯শে মে ফিরে এসে আমরা শিকারায় চড়ে ঝিলাম নদীতে, ডাল হ্রদেও নাগিনে বেড়াতে বেরুলাম। যেতে যেতে শহরের সৌন্দর্য চোখে পড়ল। সেইদিনই আমরা কাশ্মীর যাদুঘর ও কাশ্মীর এম্পোরিয়ামের বাগান দেখলাম। অনেক অজানা ফুলের সঙ্গে পরিচয় হল। ডাল হ্রদের তীরে, শ্রীনগরের উপকণ্ঠে, হজরৎবলে পয়গম্বরের পবিত্র কেশগুচ্ছ রক্ষিত আছে। মসজিদটা বিরাট জায়গা দখল করে রয়েছে। এর দেওয়ালের কারুকার্য্য দর্শনীয়। লেকটি দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচ মাইল, এবং প্রস্থে দুই মাইল। এর জলের চারিদিকে পাহাড় ও পাইনের ছায়া পড়ে হ্রদটিকে পরম রমণীয় করে তুলেছে। এই ডাল হ্রদের সহিত বাঙ্গালীর একটি বিষাদময় স্মৃতি জড়ান রয়েছে। এই হ্রদের তীরে হেদার ভিলায় ১৯৫৩ সালের ২৩শে জুন বাংলার পুরুষসিংহ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেহরক্ষা করেন। নাগিন লেকের জল এত স্বচ্ছ যে নীচের জলজ উদ্ভিদ সমূহ পরিষ্কার দেখা যায়। এখানে জলের ওপর একটা প্রমোদাগার আছে।

৩০শে মে আমরা চারদিনের কর্মসূচি নিয়ে সকাল বেলায় পহলগাঁও যাত্রা করলাম। শুনেছিলাম, এখানকার জল নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। তাই এটা স্বাস্থ্যকামীদের বিশেষ প্রিয় জায়গা। দুপুর বেলায় আমরা সেখানে পৌছলাম। আমাদের হোটেলটি ছিল ঠিক লিডার নদীর ওপরে। জায়গাটা সকলেরই খুব পছন্দ হয়েছিল। এই পার্বত্য নদীটি দিনরাত অবিশ্রান্ত গর্জনে ছুটে চলেছে। জলটা অসম্ভব ঠাণ্ডা। এখানকার শীত গুলমার্গের মত অত অসহ্য নয়। বছরের পর বছর তীর্থযাত্রীরা তুষার তীর্থ অমরনাথে যাওয়ার জন্য এখানে সমবেত হয়। শুনলাম, এ বছর হিমবাহের চাপে একটা পুল ভেঙ্গে গিয়েছে। এখান থেকে বাইরে আর কোথাও যাওয়া হয়নি। ২রা জুন আমরা শ্রীনগরে ফিরে এলাম। তারপর সুপেয় জলের বিখ্যাত হ্রদ উলার দেখে আমরা কাশ্মীর পরিক্রমা শেষ করলাম।

কাশ্মীর আমার মতে ভারতের দরিদ্রতম দেশ। বড়-ছোট, ছেলে-মেয়ে সবাই বেরিয়ে পড়েছে অর্থের অন্বেষণে। ভীষণ শীতের মধ্যে তাদের গায়ে নেই বস্ত্র, মুখে নেই খাদ্য। জানি না, শীতকালে এরা কি করে। পথে প্রতিদিন চোখে পড়েছে একা গাড়ীর পিছনে ধাবমান কুলির দলকে—মোট বইবার আশায়। দেখে আশ্চর্য্য মনে হয়, সমস্ত দেশটা একপ্রকার বহিরাগত ভ্রমণকারীদের ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। চারদিকে যা কিছু চোখে পড়ল সবই ভ্রমণকারীদের জন্য। যাত্রীরাই এদের উপার্জনের প্রধানতম উপায়। টাঙ্গাওয়ালা চলেছে কোন এক বিদেশী সাহেবকে নিয়ে। শিকাড়াওয়ালা চলেছে হয়তো কোন এক বাঙ্গালীবাবুকে নিয়ে। দোকানপাট, বাড়ীঘর ও রাস্তা ঘাটে সেই টুরিস্টদের সমাবেশ। শ্রীনগরে বৈদ্যুতিক আলোর শক্তি এত কম যে, তাতে না চলে পড়া, না চলে খাওয়া, না চলে চলা।

এদেশের অধিবাসীদের গায়ের রং খুব ফর্সা। এদের মুখশ্রীও খুব সুন্দর। শিশু-গুলিকে দেখলে দেবশিশু বলে মনে হয়। লাল টুকটুক করছে তাদের মুখগুলি। এখানকার প্রত্যেকটি নরনারীই খুব কর্ম্মঠ। এদের শতকরা আশিজনের বেশী মুসলমান। কিন্তু মসজিদ থেকে মন্দির, বিশেষ করে শিবমন্দিরের সংখ্যা এখানে বেশী। গুলমার্গে শীতের আধিক্যটা একটু প্রবল। এজায়গাটা বছরে নয় মাসই তুষারাচ্ছন্ন থাকে। এটি সমুদ্রবক্ষ থেকে ১০০০০ ফিট উচ্চে। এখানকার চেনার ও পপলার গাছই খুব বিখ্যাত। চেনার পৃথিবীর আর কোথাও জন্মায় না।

শেষ পর্য্যন্ত কাশ্মীরকে বিদায় দিতে হল। পুণ্যবল ক্ষীণ হ'লে স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে মানুষকে মর্তে ফিরে যেতে হয়। সুদূর বাংলার প্রান্তরের অধিবাসী আমাকেও গৃহে ফিরে আসতে হল। কাশ্মীর আমার জাগ্রত স্বপ্ন। তার সৌন্দর্য, তার স্বপ্ন রাত্রিদিন আমার মনে জেগে উঠছে। স্বপ্নাবিষ্টের মত এখনও আমার মন উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে কাশ্মীরের অরণ্য পর্বতে, উপত্যকায়, সানুদেশে, হ্রদ ও নদীর তীরে তীরে কাকে যেন খুঁজে ফিরছে। এই অন্বেষণ আমার জীবনে আর কখনও শেষ হবে না। কাশ্মীরের মধুময় স্মৃতি আমার জীবনের মূলে বাসা বেঁধেছে। কাশ্মীরের জল, স্থল, উপত্যকা, তুষারমণ্ডিত গিরি-পর্বত, তার ফুলের সমারোহ আমার মনকে অহর্নিশি দোলা দিচ্ছে। প্রকৃতি তার সৌন্দর্য ভাণ্ডার নিঃশেষ করে যেন একখণ্ড স্বর্গ রচনা করেছেন। কাশ্মীর সত্যই ভূ-স্বর্গ। মনে পড়ে সেই স্মরণীয় উক্তি :—"পৃথিবীতে স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা এইখানে, এইখানে, এইখানে।" এই কাশ্মীরের সৌন্দর্য দেখে পণ্ডিত নেহেরু মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেছিলেন,

'এই দেশের সৌন্দর্য ও সুষমা আমাকে মুগ্ধ করেছে; আমার মনের চারদিকে একটা মায়াজাল বুনে দিয়েছে। স্বপ্নাবিষ্টের মত আমি ইতস্ততঃ এখানে ঘুরে বেড়িয়েছি; যে অতুলনীয় লাবণ্যরাশি মানুষের বাসনার ঊর্ধ্বে, এমন এক অনবদ্য সৌন্দর্য ও লাবণ্যের অধিকারিণী রহস্যময়ী রমণীর মত কাশ্মীর তার ললনাসুলভ সৌন্দর্যের সমস্তটুকু নিয়ে আমার সম্মুখে মূর্তিমতী হয়ে উঠেছে।'

মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা।
কি যাদু বাংলা গানে!
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে!
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

—অতুলপ্রসাদ সেন

সাগর বেলায়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার

প্রথম বর্ষ। বিজ্ঞান

মানুষের রহস্যময় অন্তরের সুনিভৃত কোণে ঘুমিয়ে থাকে এক চিরন্তন উদাসী যাযাবর। সভ্যতা-নাগিনী আষ্টেপৃষ্ঠে মানুষকে জড়িয়েও পারল না তার অপমৃত্যু ঘটাতে। তাই আজও মানুষ মুগ্ধ হয় দূরের নিবিড় স্তব্ধ বনানী, মৌন বন্ধুর তুষার-মৌলী পর্ব্বতমালা, ঊর্মিমুখর বিশাল সিন্ধুসৈকত, সুদূরবিসারী বিজন প্রান্তরের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে—স্থিতিশীলতার ছদ্মবেশ খুলে ব্যাকুল হৃদয়ে বেরিয়ে পড়ে চলার পথে। মুক্তির আনন্দে খাঁচার পাখী তার বন্ধ ডানা প্রাণপণে ঝাপ্‌টিয়ে উড়ে বেড়াতে চায় নীল আকাশের বুকে।

ইট-কাঠ-লোহায় গড়া এই মহানগরীর মাঝে মন হাঁপিয়ে ওঠে, উধাও হ'য়ে যেতে চায় দূরে—বহুদূরে প্রকৃতির ছায়াঘন নিরালা ক্রোড়ে, যেখানে কোনদিন পৌঁছাবে না কোলাহলমুখর এই নগরীর আহ্বান। গত বছর প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার পর এই ব্যাকুলতা যে অসহনীয় হ'য়ে উঠেছিল। তাই ঠিক এমনি সময়ে যখন অপ্রত্যাশিতভাবে পুরী যাওয়ার কথা ঠিক হলো, তখন আনন্দের আর অবধি রইল না। মানসচক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদাই উদ্ভাসিত হতে লাগল সমুদ্রের কত বিচিত্র রূপ।

অবশেষে সমস্ত প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এপ্রিলের এক সন্ধ্যায় পুলক-বিহ্বল চিত্তে আমরা উঠে বসলাম পুরী এক্সপ্রেসের ছোট একখানা কামরায়। ঠিক হ'লো, সেদিন রাত্রে আমরা খড়্গপুরে গিয়ে থাকব; পরের দিন রাত্রে সেখান থেকে আরো কয়েকজনকে নিয়ে সেই পুরী এক্সপ্রেসেই রওনা হব।

হাওড়া ছেড়ে গোটাকয়েক ষ্টেশন যাওয়ার পরই দেখি, কামরার প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ভেতরে আর সাড়াশব্দ নেই। কেবল চলমান ট্রেণের একঘেঁয়ে গর্জ্জন কর্ণেন্দ্রিয়কে সজাগ করে রাখে। রাতের ট্রেনের এমন নির্জ্জন কামরায় বসে যাওয়ার সুযোগ পূর্ব্বে আর কখনও হয়নি। পূর্ণিমা রাতের শুভ্র জ্যোৎস্নায় দুধারের দিগন্তবিসারী প্রান্তর তখন আবেশমুগ্ধ। সে আবেশের প্রলেপ তখন আমার মনেও লেগেছে। ভুলে গেলাম ফেলে আসা জগতের কথা। উদাস দৃষ্টি মেলে শুধু চেয়ে

রইলাম দূরে মাঠের পানে। জ্যোৎস্না-প্লাবিত সেই বিশাল প্রান্তরের বুকে দ্বীপের মত ভেসে আছে তরুলতায় ঘেরা ছোট ছোট এক একখানি গ্রাম। জ্যোৎস্নালোকিত গ্রামগুলির সে কি মোহিনী রূপ। গাছের পাতায় পাতায় ঝরে পড়ছে বিগলিত জ্যোৎস্নার রজতধারা। আনন্দের হিল্লোলে তারা হ'য়ে উঠেছে চঞ্চল। তাদের শাখা-প্রশাখার ফাঁকে ফাঁকে অবগুণ্ঠিতা পল্লীবধূর মত এক একবার উঁকি দেয় কৃষকের পর্ণকুটীর। তরল জ্যোৎস্নাধারায় তারা হ'য়ে উঠেছে অপূর্ব লাবণ্যময়ী। বাঁশবাগানের ফাঁক দিয়ে কখনও বা দেখা যায়, সেই সব কুটীরের মাঝে মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে এক একটি প্রদীপ। আবার কখনও বা দেখা যায়, এক একটা মেঠো পথ গাছপালার ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে কোন্ দূরের গাঁয়ে। দেখতে দেখতে কখন যে তাদের মাঝে হারিয়ে গেলাম, জানতেও পারি নি।

পরের দিন সন্ধ্যার পর পুরী এক্সপ্রেসের আশায় খড়্গপুর ষ্টেশনের প্লাট্‌ফর্মে ঢুকে দেখি, লোকে লোকারণ্য। একটু পরেই এক্সপ্রেস্ এসে পড়ল। কিন্তু গাড়ীতে তিল ধারণের স্থানও নেই। অগত্যা নিরাশ হ'য়ে বসে থাকতে হ'লো স্পেশাল্ পুরী এক্সপ্রেসের আশায়। কিন্তু যথাসময়ে দেখা গেল, সে ট্রেণের অবস্থাও তথৈবচ। হাওড়া থেকেই গাড়ী ভর্ত্তি। তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েকটি কামরায় যথেষ্ট স্থান ছিল। কিন্তু সে কামরাগুলোয় প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব। কারণ, যাত্রীরা প্রয়োজনাতিরিক্ত স্থান দখল করে ভেতর থেকে চাবি দিয়ে কেউ বা শুয়ে আছেন, কেউ বা মুচ্‌কি হেসে প্লাট্‌ফর্মের যাত্রীদের দুর্দশার দৃশ্য রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছেন, কেউ কেউ তাস-দাবা নিয়ে ব'সে গেছেন। আবার কেউ বা এই কুরুক্ষেত্রের মধ্যেও বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে গভীর অভিনিবেশ সহকারে সরস্বতীর আরাধনায় রত। অবশ্য এভাবে যাওয়ার অধিকারও তাঁদের ছিল বইকি! তারা যে আগে থেকে সীট্ রিজার্ভ করে রেখেছিলেন! কিন্তু তাঁদের সেই নিরঙ্কুশ অধিকারকে স্বীকৃতি জানাবার মত শিক্ষা তো আর সকলের থাকে না। ফাঁকা কামরায় তাঁরা দশজনের স্থান সাতজন বা আটজন দখল করে থাকবেন, অথচ অন্য যাত্রীরা মেঝের ওপর দাঁড়িয়েও যেতে পারবেন না এমন কথা নির্বিবাদে মেনে নেওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। তাই জোর করে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা, জানালার কাচ ভাঙ্গাভাঙ্গি ও মধুর সম্বোধনেরও আর অন্ত থাকে না।

দাদা ব্যাকুল হ'য়ে এমনি একখানি কামরার জানালার কাছে গিয়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে সানুনয়ে বললেন, "দেখছেন তো কি মুস্কিলেই পড়েছি? দয়া করে

মেয়েছেলে আর এই বাচ্চাকটিকে অন্ততঃ তুলে নিন। ওরা না হয় মেঝের ওপরে বসেই যাবে'খন।" কিন্তু ভদ্রলোক একটু মুচ্‌কি হেসে নাটকীয় ভঙ্গিতে গ্রীবা হেলিয়ে সবিনয়ে "মাপ করবেন, দাদা" বলেই আস্তে আস্তে দাদার মুখের সামনে জানালার ডালাটা নামিয়ে দিলেন। মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম তাঁর ভদ্র ব্যবহারে! সন্দেহ হলো, ভদ্রলোকের বাইরের আবরণের সঙ্গে ভেতরের মানুষটির কোন সম্পর্ক আছে তো? আবার আশঙ্কাও হলো, আমাদের দেশে এমন সহৃদয় ভদ্রলোক খুব বেশী নেই তো?

এদিকে পর পর দুখানা ট্রেন ছেড়ে দিয়ে সকলেই তখন একেবারে হতাশ হ'য়ে পড়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, মানুষের আশারও অন্ত নেই। অত কষ্ট সহ্য করার পরও আমরা ব'সে রইলাম ঘণ্টা দেড়েক পরে যে জনতা এক্সপ্রেস্ আসছে তারই আশায়। কিন্তু হায়, জনতাতে মিশে যাওয়ার সৌভাগ্যও আমাদের হ'লো না। শেষে নিরাশ হ'য়ে সেদিনের মত কোয়ার্টারে ফিরে যাওয়াই ঠিক হলো। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মতের পরিবর্তন ঘটলো। অবশেষে রাত দু'টোয় আমরা পুরী প্যাসেঞ্জারের একখানা কামরায় উঠে বসলাম।

গভীর রাত। ক্লান্তদেহে অনেকেই তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাকী সবাই বসে বসে ঢুলছেন। আমাদের ছোট্ট কামরাখানায় অদ্ভুত নীরবতা। দু'ধারের গ্রামগুলিও গভীর সুপ্তিমগ্ন। রূপকথার ঘুমন্ত পুরীর মধ্য দিয়ে যেন ছুটে চলেছে আমাদের ট্রেন। চাঁদের আলো নেই। কালো আকাশে শুধু মিট্‌মিট্ করছে অসংখ্য নক্ষত্র। তাদের ক্ষীণ রশ্মিতে দূরের তমসা যেন আরও রহস্যময়। বিচিত্র ঔদাস্যের আবেশে বিমোহিত হ'য়ে নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে দূরের সেই আবছা অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলাম। হারিয়ে গেলাম যেন কোন্ এক অজানা অচেনা স্বপ্নের দেশে। ক্রমে রাত শেষ হ'য়ে আসতে লাগল। আকাশের রাজসভা শূন্য করে পাত্রমিত্র পারিষদ নক্ষত্রেরা একে একে গাত্রোত্থান করলেন। সজাগ প্রহরী শুকতারা কিন্তু বিনিদ্র নয়নে তখনও বসে আছে আকাশের এক কোণে।

সকালবেলা উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। ফাঁকা কামরায় এক একটা সীট্ এক একজনে দখল করে বসে আছি। অনেকেই ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে আছেন। হঠাৎ চোখে পড়ল এক বিচিত্র দৃশ্য। দূরে আকাশের গায়ে ঘনকৃষ্ণ মেঘের দীর্ঘসারি যেন দিক্‌চক্রবাল আচ্ছন্ন করে আছে। এর আগে এমন অদ্ভুত দৃশ্য কখন দেখি নি। নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম সেই দিকে। এমন সময় মনে পড়ল

সঞ্জীবচন্দ্রের পাহাড়ের বর্ণনা, "দূর হইতে মনে হয় যেন মর্ত্তে মেঘ করিয়াছে।" আগেই শুনেছিলাম যে পুরী যাওয়ার পথে পাহাড় দেখা যায়। বিপুল বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে ভাবলাম, এই কি তবে সেই বহু আকাঙ্খিত পাহাড়। একটু পরেই এ কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটলো, কিছুদূরে একসারি পাহাড় এবার স্পষ্ট দেখা গেল। তাকে আর মেঘ মনে হয় না, স্পষ্টই পাহাড় বলে চেনা যায়। পাহাড়ের ওপর সবুজ ঝোপজঙ্গল পরিষ্কার দেখা যায়। ঐতো অদূরেই গাছের সারি। তার পরেই পাহাড়। মনে হয় যেন কত কাছে!

বর্ষার আগমনে মাঝে মাঝে সোল্লাসে প্রলয়-নৃত্যে মেতে ওঠে যে ব্রাহ্মণী, বৈতরণী, মহানদী—আজ রূপোর কাঠির স্পর্শে কে যেন তাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। আর তাদের বন্ধ করেই যেন মানুষ, গরু, ছাগল সদর্পে পার হ'য়ে যাচ্ছে তাদের বুকের ওপর দিয়ে। অলক্ষ্যে অদৃষ্টদেবীর ঠোঁটের কোণে হয়ত ফুটে উঠছে বাঁকা হাসির রেখা।

দেখতে দেখতে ট্রেন ভুবনেশ্বরে এসে পৌছল। বেলা তখন দ্বিপ্রহর। ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে সেদিনের মত আশ্রয় নিলাম একটা ধর্মশালায়।

সন্ধ্যার আগে গেলাম ভুবনেশ্বরদেবের মন্দির দেখতে। বিশাল চত্বরের বুকে নানা খ্যাত অখ্যাত দেবদেবীর শতাধিক ছোট-মাঝারী মন্দিরের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বহুশতাব্দীর প্রাচীন লিঙ্গরাজদেবের মন্দির। ধূপ-ধুনার গন্ধ নেই, সন্ধ্যারতির শব্দ নেই, ভক্তবৃন্দের আরাধনারও সাড়া নেই। চারিদিকে গভীর নির্জনতা। মন্দির যে কখনো সমাধিস্থানের মত এমন নিস্তব্ধ হ'তে পারে, এ ধারণা পূর্বে ছিল না। নিঝুম সন্ধ্যার অন্ধকারে বিজন প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যেন মনে হয়, প্রত্নতাত্ত্বিকের আবিষ্কৃত সুদূর অতীতের কোন এক ঐতিহাসিক নিদর্শনের ধ্বংসাবশেষ দেখতে এসেছি। মন ভরে ওঠে এক অদ্ভুত অনুভূতিতে।

পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে মন্দিরটি নাকি এমন কৌশলে নির্মিত যে, কোন সময়েই এর ছায়া চত্বরের উপর এসে পড়তে পারে না। মন্দিরের গায়ে যে অপূর্ব কারুকার্যময় চিত্রাবলী খোদিত তা' সত্যই অবিস্মরণীয়। এই অঞ্চলে প্রত্যেক মন্দিরে পশুরাজের প্রতিমূর্তি দেখে মনে হ'লো, সিংহকে বোধহয় সে যুগে ধর্মের প্রতীক রূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পথ সুড়ঙ্গাকৃতি ও অন্ধকারময়। ধূপধুনার সুবাসহীন ভেপ্‌সা গন্ধেভরা সেই সুরঙ্গপথে চলতে চলতে কেমন যেন একটা অজানা বিভীষিকা ও অস্বস্তিবোধ হ'তে লাগল। তাই বিগ্রহ দর্শন করে হাতজু'খানা কোন রকমে কপালে ঠেকিয়েই বাইরে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে

বাঁচলাম। তারপর মন্দিরের প্রায়ান্ধকার নির্জন সোপানের ওপর কতক্ষণ যে অন্যমনস্ক হ'য়ে নিঃশব্দে বসে ছিলাম সে কথা আর মনে নেই।

মন্দিরের বাইরে একটা সাইন্‌বোর্ডে এই মন্দিরের সংক্ষিপ্ত কাহিনী লেখা আছে। তবু ধর্মবিশ্বাসের নামে স্থানীয় পাণ্ডারা এই ভ্রান্ত ধারণা এখনও পোষণ করে যে, বিশ্বকর্মা এসে এক রাত্রের মধ্যে এই সমস্ত মন্দির নির্মাণ করেন, মানুষের দ্বারা এমন মন্দির নির্মাণ কখনও সম্ভব নয়। জানি না, আর কতদিন তাদের এমন কুসংস্কার ও অজ্ঞতার অন্ধকারে আবদ্ধ থাকতে হবে!

ভুবনেশ্বরকে পেছনে ফেলে পরদিন বেলা ১১টায় আমরা পুরী এসে পৌছলাম। জগন্নাথদেবের মন্দিরের কাছেই একটা বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা হলো।

বেলা একটু পড়ে এলে জগন্নাথের মন্দির দেখতে গেলাম। মন্দিরের তোরণের কাছে পৌছতেই যেন মৌচাকে ঢিল পড়লো। কোথা থেকে এক ঝাঁক পাণ্ডা এসে ছেঁকে ধরল, পূজো দিতে হবে। অনেক রকম করে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, পূজো দিতে আসি নি, মন্দির দেখতে এসেছি। কিন্তু তাদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া অত সহজ নয়। আমাদের ইহলৌকিক পাপক্ষালন ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধনের মহান ব্রতে আত্মোৎসর্গ করেছে তারা। আমাদের অনিচ্ছার জন্যে সেই পবিত্র ব্রত থেকে তারা বিচ্যুত হবে কেন? তাই অনেক বাদপ্রতিবাদের পর পরদিন পূজো দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপাততঃ তাদের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। বিশাল চত্বরের ওপর বিরাট মন্দির দাঁড়িয়ে আছে। ঘুরে ঘুরে মন্দিরের গঠন-নৈপুণ্য দেখতে দেখতে মুগ্ধ হ'য়ে যেতে হয় প্রাচীন ভাস্করদের শিল্পকুশলতায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই চোখ নামিয়ে নিতে হয় মন্দিরের গায়ে খোদিত কতকগুলো অশ্লীল মূর্ত্তি দেখে। জানি না, কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লুকিয়ে আছে ওগুলোর মধ্যে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে ব্যাকুল চিত্তে এগিয়ে চললাম সমুদ্রের দিকে। কিছুদূর যেতেই কাণে এলো সমুদ্রের গম্ভীর গর্জন। বুকের মাঝে স্পন্দন যেন হঠাৎ অত্যন্ত বেড়ে গেল! প্রতি মুহূর্তে মনে হ'তে লাগল, কল্পনার সিন্ধু ও বাস্তবের সিন্ধুর মাঝখান থেকে ব্যবধানের পর্দা এই বুঝি সরে গেল! বিস্ফারিত চোখের সামনে এই বুঝি উন্মুক্ত হলো অপূর্ব মায়ালোকের রুদ্ধ গবাক্ষ! অন্তর ভরে গেল বিচিত্র উত্তেজনায়। কিছুক্ষণ পরে ব্যবধানের পর্দা সত্যিই সরে গেল। সমস্ত উত্তেজনাকে ছাপিয়ে উঠল গভীর বিস্ময়, কৌতূহল, আর হর্ষ। দূর দিক্‌চক্রবালে গাঢ় নীল আকাশ যেন ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে।

অভিভূত চিত্তে মন্ত্রমুগ্ধের মত গিয়ে বসলাম বালুকা বেলায়। কানে আসতে লাগল অবিরাম গম্ভীর গর্জন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম লক্ষ লক্ষ ফেনিল ঢেউয়ের দিকে। হাসিতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে তারা ছুটে আসে সৈকতকে সোহাগ জানাতে। কিন্তু নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে মর্মাহত হ'য়ে তখনি আবার আনতমুখে আত্ম-গোপন করতে ছুটে পালায়। কিন্তু বেশীক্ষণ তারা দূরে থাকতে পারে না। পরমুহূর্তেই আবার গভীর আবেগে ছুটে আসে। শত উপেক্ষা বিস্মৃত হ'য়ে সৈকতের পায়ে নিঃশব্দে সমর্পণ করে যায় ঝিনুকের অর্ঘ্য।

সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে। নিস্তব্ধ সাগরবেলা ঢেকে গিয়েছে আবছা আঁধারে। সিন্ধুর কলরোল যেন আরও গম্ভীর। ফেনার শুভ্র কিরীট মাথায় পরে ছুটে আসছে ঢেউয়ের পর ঢেউ। কালো আকাশে আমাদেরই মত মুগ্ধ চোখে বসে আছে কতকগুলো নক্ষত্র; তন্ময় হ'য়ে দেখছে জলধির এই বিচিত্র লীলা।

ভোরবেলা উঠে দল বেঁধে ছুটলাম সমুদ্রের ধারে সূর্য্যোদয় দেখতে। দিশাহারা হ'য়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। শেষ রাতের আবছা আঁধারের প্রলেপ সৈকতের গায়ে তখনও লেগে আছে। কিছুক্ষণ পরেই আঁধার মিলিয়ে গেল। দিগন্তের এক কোণে সমুদ্রের নীল জল যেন ঈষৎ রঙীন হ'য়ে গেল। একটু পরেই বিশাল সিন্ধুর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ডুব সাঁতার দিয়ে এসে আরক্তমুখে সূর্য্যদেব সেইখানটায় টুপ করে মাথা তুললেন। তাঁর এই আকস্মিক আগমনে লজ্জাবতী ঊর্মি-কুমারীদের মুখগুলিও সরমে লাল হ'য়ে উঠলো।

কিছুক্ষণ পরে নিঃসঙ্গ হ'য়ে একা একা বেরিয়ে পড়লাম। নির্জন বালুকাবেলার উপর দিয়ে জলের কিনারে কিনারে উদাস চিত্তে এগিয়ে চললাম খেয়ালী সিন্ধুর বিচিত্র লীলা দেখতে দেখতে। অপরিসীম আনন্দে অন্তর কানায় কানায় ভরে উঠল। ভেবে অবাক হলাম, বিশ্বপ্রকৃতির বিপুল উৎসবের আমন্ত্রণ ভুলে সংসারী মানুষ নগরের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে নিজেকে সারা জীবন আবদ্ধ রাখে কি করে? মনে হলো, প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য আহ্বান ও সংসারের পিছটান— সুদূরপিয়াসী মন ও হিসেবী বিবেক —এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে, বিশ্বপ্রকৃতির নিভৃত অন্তরে অনাদিকাল থেকে বাজছে যে অনন্ত সঙ্গীতের সুর, তাকে খুঁজে বেড়াবার জন্যেই হয়ত প্রাচীন ভারতীয় সমাজে মানুষ প্রথম জীবনে সংসারধর্ম পালন করে উত্তর জীবনে বানপ্রস্থ অবলম্বন করত। মনের মাঝে কে যেন বার বার বলতে লাগল, লিভিংষ্টোন্, ষ্ট্যান্‌লি, কুক, কলম্বাস—এঁরা নিছক দেশ আবিষ্কার করে খ্যাতি পাওয়ার আশাতেই

ঘরের বাঁধন ছেড়েন নি, মোহিনী প্রকৃতির নিঃশব্দ ইসারাই হয়ত তাঁদের ঘরছাড়া করে ছেড়েছিল।

সঙ্গীদের ছেড়ে একা একা কতদূর চলে গিয়েছিলাম, খেয়াল ছিল না। হঠাৎ চোখে পড়ল, সূর্য্য অনেক উপরে উঠে গিয়েছে। মনে পড়ল, সকলে আমার জন্য হয়ত এতক্ষণ উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছেন। জোর পায়ে ফিরে চললাম পেছনের দিকে।

ফিরে এসে দেখি, ফেনিল তরঙ্গমালার উচ্ছ্বসিত হাসির সঙ্গে স্নানরত নরনারীর প্রাণখোলা আনন্দ কোলাহল মিশে সাগরবেলাকে মুখর করে তুলেছে। শুনেছি মায়ের কাছে সকল সন্তানই সমান; বুড়ো ছেলেও যেমন, কচি ছেলেও তেমন। কথাটা যে কত বড় সত্য, তা বোধকরি এই দৃশ্য না দেখলে সম্যক উপলব্ধি করতে পারতাম না। নগরে যে কৃত্রিম সভ্যতা-বোধ প্রতি মুহূর্তে মানুষের প্রাণপ্রাচুর্য্যের প্রতি কটাক্ষ হানে, এখানে এসে তা' যে কখন অলক্ষ্যে খসে পড়ে যায় সে কথা কেউ জানতেও পারে না। বয়স্কের গাম্ভীর্য, অভিজাতের স্বাতন্ত্র্যবোধ, কুলাঙ্গনার লজ্জা সবই ভেসে গেছে ঊর্মি-কুমারীদের উচ্ছল হাসির প্লাবনে। জলের মধ্যে আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই মহা সমারোহে সোরগোল করে নেচে চলেছেন ঢেউয়ের তালে তালে। সঙ্গীদের খুঁজে নিয়ে আমিও ঝাঁপিয়ে পড়লাম তরঙ্গের আলিঙ্গন গ্রহণ করতে।

অবশেষে বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এল। সেদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গতেই বিজয়ার প্রভাতী সানাইয়ের সুরের মত কানে বাজল, আজ চলে যেতে হবে। মনে হলো চারিদিকেই যেন ধ্বনিত হ'চ্ছে একটা চাপা কান্নার সুর। সেদিনও প্রভাতে গেলাম সমুদ্র দেখতে, বসলাম সাগরবেলায়, চেয়ে রইলাম ক্রীড়াচঞ্চল আত্মভোলা সিন্ধুর দিকে; শেষ বারের মত নামলাম ঢেউয়ের সাথে খেলা করতে, মুগ্ধও হলাম। কিন্তু বার বার শুধু মনে পড়তে লাগল—আজ চলে যেতে হবে।

ভেবে ছিলাম বিকালবেলা সমুদ্রকে শেষ বারের মত বিদায় জানিয়ে আসব। কিন্তু তা আর হ'য়ে উঠল না। বেলা পড়ে এলেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বেরিয়ে পড়তে হলো ষ্টেশনের উদ্দেশে। পথে যেতে যেতে কতকগুলো বাড়ীর ফাঁক দিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল দূরে বালুকাবেলার শেষে সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে। মনে হলো সে যেন ডাক দিয়ে বলছে, "ওরে যাস নে, ফিরে আয়।" কিন্তু ফেরা আর হলো না। অন্তরালে মিলিয়ে গেল উদ্বেল সিন্ধুর শেষ হাতছানি। মনের মধ্যে কে যেন অব্যক্ত বেদনায় অসহায়ভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

দুর্গাপুরের ডাকে

শ্রীআলোককুমার হালদার

তৃতীয় বর্ষ। সাহিত্য

নূতন ছাত্রাবাসের প্রাত্যহিক জীবনের বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে একটা একঘেয়েমি আসে। তাই একটু অবকাশ পাওয়ামাত্রই আমাদের ভেতরের মুক্তিকামী মানুষটি ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। দূরের আহ্বান তার কানে আসে, ঘরে আর সে থাকে না, বাইরে বেরিয়ে পড়বার জন্য সে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে।

বড়দিনের ছুটি এসে গেলো, আর আমরাও বেরিয়ে পড়লাম। দল বেঁধে বেড়ানোর সুযোগ আমাদের জীবনে খুব কমই আসে।

পঁচিশে ডিসেম্বর। বেলা দশটা। শিয়ালদহ ষ্টেশনে অপেক্ষামান দিল্লী এক্সপ্রেসের একটি রিজার্ভ বগির বড় কামরাটিতে আমরা উঠে বসলাম। শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ শ্রীসোমেশ্বরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সহাধ্যক্ষ শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার, অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীশিশিরকুমার দাস, শ্রীকান্তীশ মাইতি, শ্রীবিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধীক্ষক শ্রীনীরদ কুমার ভট্টাচার্য প্রভৃতি অধ্যাপকদেরও আমরা সঙ্গে পেয়েছিলাম। বলাবাহুল্য আমাদের এই ভ্রমণের কর্ণধার হ'চ্ছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় অধীক্ষক শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনি সকল সময়ে এবং সকল কাজে উৎসাহ, সদুপদেশ ও সহযোগিতা দিয়ে সুন্দরভাবে আমাদের পরিচালিত করেন।

ট্রেন ঠিক সময়েই ছাড়ল। আমরা খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছি। বাইরের মুক্ত হাওয়ায় আমাদের বদ্ধ মনটা যেন ছেড়ে গান ধরল। এই পরিবেশের মধ্যে নতুন গায়কদের সঙ্গীত চর্চা বেশ উপভোগ্য হ'ল।

এই রকম হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে আমরা বর্ধমান ষ্টেশনে এসে গেলাম। বর্ধমানে ষ্টপেজ বেশ কিছুক্ষণ, তাই ট্রেন থেকে নেমেই আমরা ষ্টলের দিকে ছুটলাম। বর্ধমানের সীতাভোগ আমাদের লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করল, কিন্তু কি করি, এই যে সবে ভাত খেয়ে এসেছি। ফেরার দিনের জন্য আপাতত ওটা রিজার্ভ করে রাখলাম।

প্রায় আড়াইটা নাগাদ আমরা দুর্গাপুর ষ্টেশনে পৌছলাম, মনটা অপূর্ব আনন্দে ভরে উঠলো। দুর্গাপুরে আমাদের থাকার জন্য একটা বাংলো শ্রদ্ধেয় শ্রীঅনিল

সেনগুপ্ত মহাশয় আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন। তাঁর সাহায্য না পেলে আমাদের দুর্গাপুর ভ্রমণ এতদূর সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠতো কিনা সন্দেহ। তাঁকে আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পূর্বব্যবস্থা মত আমরা ট্রাকে করেই বাংলোর পথে রওনা হলাম। দুর্গাপুর-ব্যারেজের ঠিক পাশেই আমাদের বাংলো। বাংলো যাওয়ার পথে একটুখানির জন্য আমরা ব্যারেজটি দেখতে পেলাম। ঐ একটুখানির মধ্যে খর রৌদ্রে উজ্জ্বল শুভ্রকায় ব্যারেজটি আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। ট্রাক থেকে বেশীক্ষণ দেখার সুযোগ না হওয়ায় বাংলোয় পৌছেই কোনরকমে খাওয়া দাওয়ার কাজ চুকিয়ে আমরা ব্যারেজ দেখতে বেরিয়ে পড়লাম ; আমাদের সঙ্গে রইলেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণ।

সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। অস্তগামী সূর্যের রশ্মিগুলো ব্যারেজের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে জল জল করে উঠছে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে যেন এক অতিকায় দৈত্য বজ্রমুষ্টিতে দামোদরের কটি দেশ আঁকড়ে ধরেছে। আমরা ব্যারেজের কাছে পৌছলাম। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা আমাদের গায়ে ও মুখে এসে পড়ছে। অশান্ত দামোদর এই অতিকায় দৈত্যটির কঠিন নিষ্পেষণে তার পূর্বেকার বিধ্বংসী রূপটি যেন কোথায় হারিয়ে ফেলেছে। চারিদিকে ধূ ধূ করছে শুধু বালি আর বালি। দামোদরের সে উদ্দাম স্রোতোবেগ কোথায়? আসন্ন সন্ধ্যার আলো-আঁধারে ভয়ঙ্কর দামোদরের মৃতপ্রায় রূপটি দেখতে দেখতে আমরা তাকে প্রণাম জানালাম। মৃত্তিকাকে সে করবে উর্ব্বরা, শ্যামল শস্যে হাসবে আমাদের সোনার বাংলা, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই মানুষকেও প্রণাম জানালাম যে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করবার স্পর্দ্ধা করে এসেছে চিরদিন।

রাত্রি নেমে এলো। আমরা বাংলোয় ফিরে এলাম। সারাদিনের পথশ্রমে আমরা তখন ক্লান্ত। তাড়াতাড়ি নৈশ ভোজন শেষ করে বাংলোয় আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে আমরা ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। আমাদের পাশের একটি ঘরে অধ্যাপকরা রইলেন। কিন্তু কোথায় ঘুম। হঠাৎ এক কোণ থেকে শোনা গেলো বিড়ালের ডাক সঙ্গে সঙ্গে আর এক কোণ থেকে উঠলো কোরাসের মত নাসিকাধ্বনি।

কোনমতে রাত কাটলো। ঘর থেকে বেরিয়েই ভোরের আলোয় ব্যারেজটিকে সুন্দর লাগলো। আমরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সেই অপূর্ব সৌন্দর্য দেখলাম। তারপর প্রাতরাশ শেষ করে আমরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হ'য়ে দুর্গাপুরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লাম। কেউবা গেল নতুন গড়ে ওঠা কলোনীর দিকে, কেউবা গেল "দুর্গাপুর

দুর্গাপুর

১

২

৩

৪

চিত্র পরিচিতি

চিত্র পরিচিতি

পানিহাটিতে পুরাতন ছাত্রাবাসের
আবাসিকবৃন্দ

১। মন্দির অঙ্গন ২। বৃষভবাহন

৩। উদ্যানবাটিকা প্রাঙ্গণে

৪। প্রত্যাবর্তনের পূর্বে

ফরেষ্ট" দেখতে, আবার অনেকে গেল বিদেশ থেকে আনা অদ্ভুত মাটিকাটা যন্ত্রটা দেখতে।

দুর্গাপুর কলোনীটি দেখতে বেশ সুন্দর। ছোট ছোট একরকমের একতলা বাড়ী, সামনে ছোট্ট একটুকরো বাগান, আর বাড়ির সামনে ও পাশ দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ গাছের ছায়াঘেরা রাস্তাগুলো কলোনীর ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছে।

দুর্গাপুর ফরেষ্টটিও নেহাত ছোট নয়। ছোট ছোট শাল ও অজানা বুনো গাছে জঙ্গলটি বুনো হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে একটু একটু ফাঁকা পাথুরে জায়গা বাইরে থেকে দেখে বোঝবার উপায় নেই। ফরেষ্টের মাঝখান দিয়ে একটা সরু পায়ে চলার পথ, কোথায় যেন মিশে গেছে।

ক্রমে দুপুর হ'য়ে এলো। আমরা বাংলোয় ফিরে এলাম এবং কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে নদের স্বল্পজলে স্নান করতে গেলাম। এরপর মধ্যাহ্ন ভোজের পালা। বাংলোর ছোট্ট সুন্দর বাগানের মধ্যে চক্রাকারে বসে শীতের দুপুরের মিষ্টি রোদে আমরা দুপুরের খাওয়া শেষ করলাম।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বিকালবেলা আমরা আবার একটা নতুন গ্রামের দিকে বেড়াতে গেলাম। দুর্গাপুরের কাছে ছোট্ট একটা গ্রাম, বীরভানপুর। গ্রামের লোকগুলির জীবনযাত্রা প্রণালী খুব সাধারণ—সকলেই কৃষিজীবী। গ্রামের ঠিক মাঝখানে একটি ঠাকুর বাড়ী, একপাশে কয়েকটি ভাঙা শিবমন্দির অশ্বত্থ গাছের জটা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামবাসীদের আবাসগৃহে সর্ব্বনাশা দামোদরের ধ্বংসলীলার স্বাক্ষর এখনও রয়ে গেছে। সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। আমরা বাংলোয় ফিরলাম।

ঐদিন সন্ধ্যায় আমরা অধ্যাপকদের নিয়ে একটা ছোট্ট জলসার আয়োজন করেছিলাম। শ্রীশক্তিপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীবিশ্বনাথ জানা প্রভৃতি বন্ধুরা গান শুনিয়ে যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছিলেন। এই জলসায় হাস্যকৌতুকই সবচেয়ে উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছিল। বিশেষত শ্রীসুবিমল দাসের "বোতলের ছিপি খোলা" ও শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায়ের "বিড়ালের ঝগড়া" বোধ হয় অধ্যাপকদের স্মৃতি থেকে এখনও মুছে যায়নি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হাস্যরসিক অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে গত বছর দীর্ঘভ্রমণে সঙ্গে না পাওয়ায় আমাদের আনন্দের একটা দিক অসম্পূর্ণ ছিল। আমাদের একান্ত অনুরোধে এবছর তিনি আমাদের সে অভাব মিটিয়েছেন।

পরেরদিন সকাল এলো। এবার ফেরার পালা। দুর্গাপুর ছেড়ে যেতে মন চায়

না, তবুও যেতে হবে। ঠিক আগের মতই দুর্গাপুর স্টেশনে এসে ট্রেনে চেপে বসলাম। ট্রেন দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ছে দুর্গাপুরের অতিকায় ব্যারেজ, রিজার্ভ ফরেষ্টের সৌন্দর্য, কলোনীর স্নিগ্ধ, শান্ত পরিবেশ, বীরভানপুর, অধ্যাপকদের সান্নিধ্য, দুর্গাপুর স্টেশন আরও কত কি। আমার মনের মণিকোঠায় দুর্গাপুরের স্মৃতি অক্ষয় হ'য়ে থাকবে চিরকাল।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

—রবীন্দ্রনাথ

আমাদের ক্যাম্প জীবন

শ্রীসুব্রত চক্রবর্ত্তী

প্রথম বর্ষ। সাহিত্য

ক্যাম্প থেকে এসেছি অনেক দিন। বেশ লাগলো ক্যাম্প : একদিকে শৃঙ্খলা এবং অন্যান্য শিক্ষণীয় জিনিষ, আর একদিকে ক্যাম্পের চারপাশের মনোরম সৌন্দর্য। ক্যাম্প সম্বন্ধে নানা রকম চিত্র এবং কল্পনাও মনে মনে এঁকেছি, কিন্তু তা' গুছিয়ে লেখার এতটুকু আগ্রহ এবং ক্ষমতা পর্য্যন্ত আমার ছিল না। কেননা, আমি লেখক নই এবং লেখবার অভ্যাসটুকু পর্য্যন্ত আমার নেই। যাই হোক, ক্যাম্প থেকে ফিরে এসে ক্যাম্পের নানা গল্প আমার বন্ধু বান্ধবদের কাছে করেছি। আজ সেই সব সহৃদয় বন্ধুদের পরামর্শে এবং তাঁদের ঐকান্তিক আগ্রহে ক্যাম্প সম্বন্ধে কিছু লিখতে বাধ্য হচ্ছি, যা' আমার ক্ষুদ্র মানসপটে এখনও কিছু কিছু আঁকা রয়েছে।

প্রথমেই পাঠকবৃন্দকে জানানো প্রয়োজন, এটাই আমার জীবনের প্রথম ক্যাম্প। এন. সি. সির ক্যাডেট হবার সংগে সংগেই ক্যাম্পে যাবার তোড়জোড় চলতে লাগলো। পুজোর ছুটির আগেই স্থান এবং তারিখও নির্দিষ্ট হয়ে গেল। স্থান হল চিত্তরঞ্জন, ৭ই নভেম্বর সাড়ে দশটায় সময় হাওড়া ষ্টেশনের ২নং প্লাটফরম থেকে একটা স্পেশাল গাড়ীতে করে আমরা যাত্রা করব। বিজয়া দশমীর কয়েকদিন পরই আমাদের যাত্রার দিন, তাই পুজোর কটা দিন যাত্রার আয়োজনেই কেটে গেল। ক্যাম্প যাত্রার রোমান্স যেন আমাদের মনকে আবিষ্ট করেছিল। ক্যাম্পে কি কি নিয়ে যেতে হবে তার একটা লিষ্ট করে ফেললাম। সেই লিষ্ট অনুযায়ী কিছু জিনিষও কেনাকাটা করতে হোলো। যাত্রার জন্য মনটা বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। প্রত্যহই মনে আসতে লাগল এক একটা নতুন পরিকল্পনা। মন অধীর হয়ে উঠল যাত্রা-দিনের প্রতীক্ষায়। অবশেষে ঘনিয়ে এলো সেই শুভ দিনটি। ক্যাপ্টেন ব্যানার্জীর আদেশ, সকাল সাড়ে আটটার মধ্যেই হাওড়া ষ্টেশনের ২নং প্লাটফর্মে উপস্থিত থাকতে হবে। তাই আগের দিনই kits bagএ সমস্ত জিনিষপত্র ভরে রেখেছিলাম। ঠিক সময় মতই ষ্টেশনে উপস্থিত হলাম। আমরা প্যারেড গ্রাউণ্ডে গিয়ে হুইসল্ বাজাবার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন in threesএ দাঁড়িয়ে পড়ি, প্লাটফর্মেও সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ কাটাতে হোলো। যাই হোক অবশেষে ভগবানের অশেষ করুণায় দুর্গানাম জপ করে গাড়ীতে উঠে ঠিক

সময় মতই যাত্রা করলাম। সেদিন আকাশ ছিল বর্ষণমুখর। বৃষ্টি-ভেজা প্রকৃতিকে সেদিন গাড়ীর মধ্যে বসে বসে দেখতে বড়ই ভাল লাগছিল।

কবির ভাষায় বলতে গেলে —

বসে জানলার পাশে সারাদিন আছি চেয়ে—
জীবনের আজি অবকাশ।

সেদিনকার সেই বৃষ্টি-ভেজা প্রকৃতির মধ্যে গাড়ীর ভিতর লঘুতরল হাস্য-পরিহাসের মাধ্যমে আমাদের আসরটি বেশ ভাল ভাবেই জমে উঠেছিল। নানারকম প্রীতিমধুর আলোচনার মধ্য দিয়ে যখন আমরা চিত্তরঞ্জনে এসে পৌছলাম, তখন অন্ধকার তার বিরাট পক্ষটি চারিদিকে বিস্তার করেছে, এবং বৃষ্টিও একদম থেমে গিয়েছে। কিন্তু আকাশ তখনও ছিল মেঘাবৃত। ষ্টেশন থেকে প্রায় দুই মাইল মার্চ করে আমরা ক্যাম্পের স্থানে পৌছলাম। ক্যাপ্টেন করের নির্দেশ অনুসারে আমাদের প্রত্যেক আটজনকে একটা করে টেণ্ট দেওয়া হ'লো। আমরা যে যার স্থান ঠিক করে কম্বল পেতে টেণ্টের ফ্ল্যাপ খুলে, বলা বাহুল্য, জলন্ত উদরের জ্বালা শান্ত করে শুয়ে পড়লাম। সারাদিনের এই দীর্ঘ পরিশ্রমের পর ক্লান্ত দেহটাকে বিছানায় এলিয়ে দেবার সংগে সংগেই নিদ্রাদেবী তাঁর হাতের কোমল স্পর্শ বুলিয়ে গেলেন আমার চোখের পাতায়, এবং আমিও মগ্ন হয়ে গেলাম নিদ্রার কোলে এক গভীর অতলে।

ভোর চারটে বাজবার সংগে সংগেই Sergeant কল্যাণ সেন আমাদের উঠিয়ে দিয়ে গেলেন। এখানে আর বাড়ীর মতন চাকরেরা এসে বিছানা পরিকার করত না। আমরা নিজেরাই ছিলুম সর্বেসর্বা। নিজেরাই পরিকার করতুম টেণ্ট এবং গুটিয়ে ফেলতুম কম্বল। এসব কাজে পাওয়া যায় একটা অফুরন্ত উদ্দীপনা এবং অনন্ত উৎসাহ। এসব তো আমাদেরই করণীয় কাজ। তবুও প্রথম দিন কল্যাণদার ডাকে কিছুটা বিরক্তি বোধ করলাম। কিন্তু অন্তর আমার মনকে আঘাত দিল, জানিয়ে দিল, এটা আমাদেরই ট্রেনিং ক্যাম্প, তাই পরক্ষণেই অন্তরে এলো অদম্য উৎসাহ। তাড়াতাড়ি উঠে হাত মুখ ধুয়ে, চা খেয়ে, পোষাক পরে প্রস্তুত হয়ে নিলুম এবং সংগে সংগে ফ্ল্যাপগুলোও গুটিয়ে ফেলা হ'লো।

আজ আর আমাদের প্যারেড হবে না। আজ দেওয়া হবে আমাদের নানারকম নির্দেশ। রাত্রি বেলা যে সহরটাকে ছোট বলে ভেবেছিলাম দিনের বেলা তাকে দূর থেকে লক্ষ্য করে সে ধারণা সম্পূর্ণ পালটে গেল। যে দিকেই তাকানো যায় সেই দিকেই পাহাড় এবং তারই কোলে কোলে রয়েছে রেলওয়ে কলোনী। ক্যাম্পের

মাইল খানেক দূরে রয়েছে চিত্তরঞ্জন লোকোমটিভ ওয়ার্কস। তারই ঘন ঘন বাঁশীর শব্দ আমাদের কর্ণকুহর বিদীর্ণ করে সারা সহরটাকে জাগ্রত করে রাখে। আমি কবি কিংবা সাহিত্যিক না হ'লেও তার যে অপরূপ সৌন্দর্য্য আমার ক্ষুদ্র মনকে দোলা দিয়েছে, তা' কোনো দিনও মুছে যাবার নয়। ষ্টেশন বরাবর সোজা একটা রাস্তা আমাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সহরের আর এক পাশে মিলিত হয়েছে। এই রাস্তারই একপাশে আমাদের শিক্ষার্থীদের টেন্ট এবং অপর পাশে আমাদের শিক্ষকদের টেন্ট। দূর থেকে আমাদের টেন্টগুলো দেখে মনে হ'তো যেন কয়েকটি কপোত কপোতী প্রেমালাপে মগ্ন। ক্যাম্পের পাশ দিয়েই ক্ষীণধারায় বয়ে চলেছে অজয় নদ। সত্যিই ক্যাম্পের চার পাশের সৌন্দর্য এত মনোরম যে, তা কোনোদিনও ভোলবার নয়। আমার মনে যদি কবিসুলভ ভাব থাকতো তবে পাঠককে আর এই লেখা পড়বার জন্য বিরক্ত করতাম না; তবে অনুরোধ জানাতাম এই ক্ষুদ্র প্রতিভার সৃষ্টি এক হ-য-ব-র-ল কবিতা পড়তে।

Lt. Chatterjee আমাদের জানিয়ে দিলেন, আমরা ক্যাম্পের সীমানার বাইরে যেতে পারব না; তা ছাড়া অন্য আরও অনেক নিষেধ বার্তা তিনি আমাদের মধ্যে ঘোষণা করলেন। রোজকার কর্মপদ্ধতিও আমাদের জানিয়ে দেওয়া হ'লো।

আমাদের Battalionএ চারটে কোম্পানী ছিল। A. Coy'তে ছিল, চারুচন্দ্র, সেন্ট্রাল ক্যালকাটা এবং সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ, B. Coy'তে ছিল আমাদের আশুতোষ কলেজ, C. Coy'তে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, D. Coy'তে বঙ্গবাসী কলেজ। টেন্টের ড্রেসিংএর জন্য প্রত্যেক Annual training camp-এই একটা পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পুরস্কার Coy'র প্রতিযোগিতা হিসাবেই দেওয়া হয়। এর জন্য আমাদের প্রত্যেক Coy'রই ছিল একটা অদম্য উৎসাহ, যদিও শেষ পর্য্যন্ত আমরা এই পুরস্কার লাভ করতে পারিনি; কিন্তু আমরা ফুটবল, বাস্কেটবল এবং L.M.G Shooting-এ পুরস্কার লাভ করেছি। এরজন্য কৃতজ্ঞতা জানাই খেলোয়াড় অমরেন্দ্রনাথ দে, অমল মুখার্জী, অরুণ পাকরাশী, পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য্য, জ্যোতি দাস প্রভৃতিকে।

প্রত্যেক দিনই ভোর চারটায় উঠে টেন্টের ড্রেসিং করে হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে P.Tর (Physical training) পোষাক পরে প্রস্তুত হয়ে নিতাম। হুইস্‌ল্ বাজবার সংগে সংগেই in threes-এ দাঁড়িয়ে পড়তাম। পঁয়তাল্লিশ মিনিট P.Tর পর আমরা পাঁচ মিনিট ড্রিলের পোষাক পরবার সময় পেতাম। দুটো পিরিয়ড ড্রিলের

পর হ'তো আমাদের ব্রেকফাষ্ট এবং তারপর সমানে ১২টা পর্য্যন্ত চলতো আমাদের অন্যান্য পিরিয়ড। অবশ্য প্রত্যেক পিরিয়ডের পরই আমরা পাঁচ মিনিট করে বিশ্রাম পেতাম। প্যারেড শেষে স্বেদবিজড়িত শ্রান্ত দেহটাকে কোনও রকমে টেন্টে নিয়ে গিয়ে তৈরী হয়ে নিতাম স্নানের জন্য এবং আমরা একতাবদ্ধ ভাবে সারি বেঁধে চলে যেতাম অজয় নদে। স্নান সেরে পোষাক পরে সারিবদ্ধভাবে থালা-মগ নিয়ে চলে যেতাম লাঞ্চ খেতে। সত্যিই বড় ভাল লাগতো যখন সারিবদ্ধভাবে স্নান করতে, খেতে কিংবা অন্য কোনো কাজ করতে যেতাম। এই শৃঙ্খলাটাই তো N.C.Cর প্রধান শিক্ষা, ছুটো রাইফেল ছোড়াই N.C.Cর প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। দেড়টার মধ্যে লাঞ্চ সেরে আমাদের টেন্ট পরিষ্কার করতে হ'তো। সাড়ে তিনটে পর্য্যন্ত এই কাজ করার পর ছিল আমাদের খেলার সময়। নানা রকমের খেলার সরঞ্জামও আমরা পেয়েছিলাম, ফুটবল, বাস্কেটবল, টেনি কয়েট, ভলিবল। খেলার মাঠেও শৃঙ্খলা বজায় রেখে খেলাধুলা করতাম। পাঁচটা পর্য্যন্ত আমাদের খেলার সময়। সাড়ে ছ'টায় রোলকল, তাই খেলার মাঠ থেকে ফিরে এসে হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে প্রস্তুত হয়ে নিতাম, এবং এই সময় আমাদের টেন্টের ফ্ল্যাপগুলো এবং কম্বলগুলো খুলে ফেলা হোতো। রোলকলের পর সাড়ে সাতটায় ডিনার।

সারাদিনের এই দীর্ঘ পরিশ্রমের পর খাওয়া দাওয়া সেরে ক্লান্ত দেহটাকে বিছানায় এলিয়ে দেবার সংগে সংগেই নিদ্রা দেবী আমাদের চোখের পাতায় আশ্রয় নিতেন।

আমাদের টেন্টের পাশেই একটা ক্যান্টিন এবং একটা Recreation tent করা হয়েছিল। আমরা অবসর সময়ে Recreation tent-এ গিয়ে মাসিক এবং দৈনিক পত্রিকা পড়তে পারতাম, তা ছাড়া আমাদের টেন্টের পাশেই একটা loud speaker এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এই ভাবে দৈনন্দিন কার্য-সূচীর মধ্য দিয়ে আমরা নানারকম প্রয়োজনীয় শিক্ষা পেতে লাগলাম। আমরা প্রত্যেক শিক্ষার্থী পয়তাল্লিশ রাউণ্ড করে Rifle এবং Light Machine Gun fire ও করেছিলাম। আমাদের একদিন War field Demonstration ও দেখানো হয়েছিল। সবশেষে আমাদের দেখিয়ে আনা হ'লো বাংলার গৌরবোজ্জ্বল কীর্ত্তি, "চিত্তরঞ্জন লোকোমটিভ ওয়ার্কস।"

ক্যাম্প জীবনের সবচেয়ে আনন্দদায়ক দিন হচ্ছে ক্যাম্প ফায়ারএর দিন। এটা রোল কলের সময়ই হ'তো, এবং প্রতি পাঁচ দিন অন্তরই আমরা ইহার সংগে

সংশ্লিষ্ট থাকতাম। এই দিনে আমরা মশগুল হয়ে যেতাম গান, বাজনা, আবৃত্তি, ম্যাজিক প্রভৃতির মধ্যে।

এই ভাবে কেটে যেতে লাগলো সময় এবং এগিয়ে আসতে লাগলো আমাদের প্রত্যাবর্ত্তনের দিন। অবশেষে এগিয়েও এলো সেই দিনটি। মন কিছুতেই চাইছিল না সেই ছবির মত ক্যাম্প ছেড়ে চলে আসতে। কিন্তু উপায় নেই, ফিরে আসতেই হবে। তাই ঠিক সময় মতই পোটলা পুঁটলি বেঁধে আমরা ২১শে নভেম্বর বিকেল চারটের সময় কলিকাতাগামী একটা স্পেশাল ট্রেনে করে আবার সেই পুরানো পথের যাত্রী হলাম। গাড়ীর সিটের উপর শুয়ে শুয়ে উদাস নয়নে বাইরের দিকে তাকাতে তাকাতে এবং ক্যাম্পের নানা ছবি মনে আঁকতে আঁকতে নিজের অগোচরে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা' নিজেই জানি না। ইঞ্জিনের ঘন ঘন বাঁশীর শব্দে যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন দেখি হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্মে গতিহীন গাড়ীর মধ্যে শুয়ে আছি।

আমাদের Break-up দেবার পর, ছবির মত ক্যাম্পের সমস্ত সৌন্দর্য আমার মনের এ্যালবামে এঁটে রেখে, ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে কোনো রকমে বাসে উঠে বাড়ী মুখো রওনা হলাম।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই Lt. Chatterjee, U/O ভগবতী প্রসাদ এবং C. Q. S. M, তুষার দাসকে; এঁরা আমাদের প্রতিটি মুহূর্তেই পরিবেশন করে এসেছেন নানা শিক্ষণীয় জিনিষ। বন্ধুবর অরুণ পাকরাশী এবং রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যকেও কৃতজ্ঞতা জানাই; এঁরা আমাদের যাত্রা পথের প্রতিটি ক্ষণেই আমাদের মধ্যে দান করেছেন তাঁদের হাস্য রসালাপের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

গ্রন্থ-সমালোচনা

নীলাম্বরী॥ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলরব প্রকাশনী। ৪।৪, রসা রোড (সাউথ) ফার্ষ্ট লেন, কলিকাতা-৩৩। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

সমাজ চেতনার উদগ্র উচ্ছ্বাসে কবিতাশিল্পের সৌন্দর্য যখন আমরা নষ্ট করতে বসেছি, তখন ভালো কাব্যপাঠের আনন্দ যে কী, কবি দেবীপ্রসাদের 'নীলাম্বরী' পাঠ করে' আপনি তা সহজেই বুঝতে পারবেন।

নানা কারণে কবিতার মধ্যে গত কয়েকবছর ধরে' অপরিচিত যত বুদ্ধিবৃত্তির চমকই আমরা দেখতে চেয়েছি; বলতে চেয়েছি: মননশীলতা-ই আধুনিক কবিতার প্রাণস্পন্দন। হৃদয় বলে' যে একটা সেকেলে পদার্থ আজ-ও আছে আমাদের জীবনে, ঋতুলীলার রূপবৈচিত্র্যের মত এখনো তা যে নিত্য-নবায়মানা—প্রগতিশীল হওয়ার প্রখর প্রচেষ্টায় তা' অস্বীকার করেছি ঘরে বাইরে। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় আমাদের মন তেমন ভরে নি—রুটিনীতির অন্ধ অনুসরণে চাঁদে রচনা করেছি ঝলসানো অন্ধকার: মননের মশাল জেলেছি বাহবা-প্রত্যাশার বীরত্বে!

এমন সময় ভালো প্রেমের কবিতা যথার্থ প্রেম, বাংলায় লেখার চেষ্টা হ'চ্ছে দেখলে' আশা হয়, আনন্দ হয়।

কবিতা বলতে যদি আনন্দের কবিতা, প্রেমের কবিতা-ও, বুঝি—এবং দুর্ভিক্ষোত্তর বাঙলাকাব্যে প্রেমের সন্ধান যদি না পাই, তবে বলতে হবে, পঞ্চাশ সালের মন্বন্তর আমাদের অন্নবস্ত্র-ই শুধু হরণ করে নি, কবিতাবৃত্তি-ও হরণ করে গেছে: কবিরা মরেছেন, অর্থাৎ ভীরু কবির দল রাজনীতিকদের হুকুম তামিল করাটাকেই মননশীলতার চরম ব'লে মনে করেছেন; প্রেমকে ভাববাদ বলে' শূন্যে উড়িয়ে দিয়ে প্রগতি করেছেন বিপুলবিক্রমে!

চণ্ডীদাসের দেশে, রবীন্দ্রনাথের দেশে প্রেমের কবি জন্মাবে না? কেন জন্মাচ্ছে না তার ঐতিহাসিক কারণ অবশ্য আছে। একদিকে ভোগলিপ্সু কামকামনার বিশ্ব নাস্তিক উদগ্রতা, অপরদিকে অন্নদৈন্যের আস্ফালনের সঙ্গে হৃদয়দৈন্যের অহংকার—বাঙলার কবিমানসে দুর্ভিক্ষের শুষ্কতা এনে দিয়েছে। সমাজতন্ত্র বস্তুবাদের দোহাই দিয়ে পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকে কাব্যজগতে আমরা ঐতিহাসিক মন্বন্তর-ই এনে দিয়েছি, —এবং যুগ থেকে পিছিয়ে থাকি নি বলে' বাহবা লুঠেছি দলগত বন্ধুসভার আসরে। কবিতাকে নিহিলিজ্‌ম্-এর ক্রীতদাসী কিংবা স্তালিনিজ্‌ম্-এর প্রচারকর্ত্রী করতে

পারাটাকেই কবিকৃতির পরম আদর্শ বলে মনে করেছি, কবিতালক্ষ্মীর ওপর প্রেম নয়, প্রভুত্ব ফলিয়েছি পত্রে-পত্রিকায়। মনে পড়ছে, কাঁচা বয়সে প্রেমের কবিতা না লিখতে চেয়ে প্রচারবাদী একজন চতুর পত্রকার বুদ্ধিদীপ্ত কতকগুলি বীরবলীয় শ্লেষ রচনার কৌশলে বাজি মাৎ করেছিলেন, এবং বুদ্ধদেব বসু-র মত পণ্ডিত রসবেত্তারও সুদীর্ঘ একখানি সার্টিফিকেট আদায় করতে পেরেছিলেন!

কিন্তু সেদিন গত হয়েছে। শীতান্তে আসছে বসন্ত। কবিতাকে হৃদয়ের শিল্প হিসাবে সম্মান দেয়ার দিন আসছে।

সাম্প্রতিক কয়েক জন তরুণ কবির রচনা পাঠ করে' ক্রমশ আমার ধারণা হচ্ছে—বাঙলা কবিতার অরাজকতার যুগ কেটেছে, কবিতার মোড় ফিরছে, কৃত্রিম বুদ্ধির লজ্জাহীন আস্ফালন এবং পরদেশী 'প্রগতিনীতির' সজ্ঞাহীন অনুকরণ থেকে বাঙলা-কবিতা ধীরে ধীরে আত্মস্বরূপে ফিরে-আসার সাধনা করছে। কবি নীরেন চক্রবর্তী, নরেশ গুহ, কি শুদ্ধসত্ত্ব বসুর কবিতায় আমি ঊষা-লোকের আভাস দেখেছি। আরো আশা ও আশ্বাসের কথা, এঁদেরই ছাত্র-কল্প ও অনুজস্থানীয় একাধিক তরুণ কবির রচনায় হৃদয়গুণ, ধ্যানবৈশিষ্ট্য ও শিল্পনৈপুণ্যের এমন প্রকাশ দেখেছি, যাতে বাঙলা-কবিতা সম্বন্ধে আশাবাদী না হয়ে পারি নে। আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, আনন্দ বাগচী, জয়শ্রী চৌধুরী, উৎপলকুমার বসু, ফণিভূষণ আচার্য, বটকৃষ্ণ দে প্রভৃতি উদীয়মান কবিশিল্পীদের আমার মনে পড়ছে। সমাজতন্ত্র বস্তুবাদের বাঁধা ফরমুলা অনুসারে কবিতা-করার হাস্যকর দুশ্চেষ্টাকে তাঁরা সজ্ঞানে পরিহার করছেন: ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে জানা-বিষয়কেই অজানার রূপসৌন্দর্যে যে শিল্পরূপ দান করা সম্ভব, সযত্নে তা তাঁরা প্রমাণ করেছেন। প্রেম বিষয়ে, প্রকৃতি বিষয়ে, দৈনন্দিন আটপৌরে জীবনের সাধারণ আশানৈরাশ্য বিষয়ে বর্ণাঢ্য নূতন কবিতা আজ-ও যে লেখা যায়—তা তাঁরা জেনেছেন: তাঁরা বুঝেছেন বিষয়টা আধুনিক হলেই কবিতা আধুনিক হয় না, সেকেলে বিষয় নিয়ে-ও চিরকালের আধুনিক কবিতা লেখা সম্ভব।

'নীলাম্বরী'-কাব্য পড়ে মনে হ'ল সাম্প্রতিক বাঙলার উদীয়মান কবিসমাজে তরুণতম কবি দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও অচিরাৎ স্থান করে নেবেন।

নীলাম্বরী তাঁর প্রথম কাব্য হলেও অনেকাংশে পরিণত কাব্য।

সব থেকে আমাকে যা মুগ্ধ করেছে তা এই: অল্প বয়সেই কবি দেবীপ্রসাদ একদিকে যেমন বাঙলার শব্দদেহের সৌষ্ঠবটি দর্শন করেছেন, অপরদিকে তেমনি রসিক চিত্তলোকের ভাবস্বরূপটিও উপলব্ধি করেছেন। প্রতিটি শব্দই হ'ল এক একটি

স্বতন্ত্র রূপ, জগৎ বা দেহ। অলংকারের যথাযথ প্রয়োগে দেহের সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য যেমন বাড়ে, নিপুণ ও যথাযথ প্রয়োগের মহিমায় শব্দদেহের সৌষ্ঠব তেমনি বৃদ্ধি পায়—আভিধানিক অভিধার্থের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে অন্ততর তাৎপর্যের রূপাকাশে হয় স্বর্ধকল্প। এই মোটা কথাটা যাঁদের জানা হয় নি, এবং সর্বোপরি রসলোকের ভাবস্বরূপটি আজ-ও যাঁদের অজানা—কাব্যের আসরে তাঁরা অকাব্যই করতে আসেন, অনিপুণ প্রয়োগের দৈন্যে শব্দদেহে তাঁরা কৃশতা আনেন, ভাবের দৈন্য লুকোবার প্রচেষ্টায় সাময়িক সমাজবিষয়ের দ্বারে ধরনা দেন।

নীলাম্বরী-কাব্য, তরুণতম একজন কবির লেখা হলেও—বলতে কিছুমাত্র দ্বিধা নেই—একখানি খাঁটি বাংলা কাব্য। কবির ভাষা ও আঙ্গিক একান্তভাবেই আধুনিক, তাঁর চিত্রকল্পরচনাতেও বেশ নূতনত্ব আছে—অথচ তাঁর বক্তব্যবিষয় বাঙালী রসচেতনার ঐতিহ্যই অনুকরণ করে।

নীলাম্বরীর কবি প্রেমের কবি, 'রূপরতি'-র কবি। দুঃখ তাঁর আছে কিন্তু তা ব্যক্তিজীবনের বিমর্ষ, অলস দুঃখ নয়, যৌবন জীবনের বলিষ্ঠ দুঃখ, যে-দুঃখ সুন্দরের সন্ধানে ফিরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে শান্তরূপরচনার স্বপ্নে বিভোর হয়, সেই দুঃখ। ব্যক্তিগতভাবে দুঃখবাদকে আমি স্বীকার করি নে, কিন্তু দেবীপ্রসাদের রূপশোভন আশ্চর্য দুঃখরুচির স্বপ্নসৌন্দর্য আমি উপেক্ষা করতে পারি নি। দুঃখের শুভ্র শুচিতা থেকে তাঁর যে মোহবিহ্বল রূপানুরাগ—সার্থক কবিতারচনার তা উৎস বলেই আমার মনে হয়েছে। তাঁর রূপরাগ নির্জন মনোলোকের বেদনাঘন আনন্দব্যোমাক, শালীন সংযম যার চরিত্রে, সু-ধীর প্রসন্নতা যার প্রেরণায়।

নীলাম্বরীর একাধিক কবিতা আমার ভালো লেগেছে, এত ভালো লেগেছে যে, একবার পড়ে তৃপ্তি পাই নি। কোনো তরুণকবির রচনা এত যত্ন করে কখন-ও আমি পড়ি নি। 'রূপরতি', 'মেঘমালা', 'চম্পামালা', 'নীলাম্বরী' ও 'এ মাহ ভাদরে'—উল্লেখযোগ্য সার্থক কবিতা। অল্প কথায় মনোরম চিত্রকল্প রচনার শক্তিটি কবি আয়ত্তে এনেছেন :

> সোনার দুপুর তবু ধূলীনীল আলোয়ান করে,
> আমনেই, বাজনেই মনটানা চপল সরোদ।

কিংবা

> একা একা গান গায় নিরজনে মধু মাঠে
> সুর হতে সুরে
> রূপমতী তটিনীর রূপোভাঙা জলের নূপুরে।

গ্রন্থ-সমালোচনা

কিংবা

হেমন্তের রোদ থেকে সোনা তোলে
সুরকণ্ঠ নদী

অল্পকথায় এমন রূপকল্প রচনা বড় সহজ কথা নয়, কম শক্তির পরিচয় নয়। নীলাম্বরী-র মধ্যে এমনতর বহু শোভন চিত্র মণিমুক্তার মত ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে—সতর্ক পাঠক এক দৃষ্টিতেই তা খুঁজে নিতে পারবেন।

আবার বলি, নীলাম্বরী একখানি ভালো কাব্য। অধ্যাপক বন্ধুদের এবং কবিতা-রসিক ছাত্রছাত্রীদের কাব্যখানি পড়তে অনুরোধ করছি। যদি পড়েন, আমার মত তাঁরা-ও কবিকে অভিনন্দিত না করে' পারবেন না, বলবেন জয় হ'ক কবির।

অধ্যাপক অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

পালা-বদল ॥ অমিয় চক্রবর্তী। নাভানা। ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩। দু-টাকা।

'পারাপারে' যে সুরের সূচনা দেখা দিয়েছিলো সে সুর 'পালা-বদলে' এসে সার্থকভাবে সুস্পষ্ট হ'ল। একটি সুচারু সংহতিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

'পালা-বদলে'র কবি 'পারাপারে'র কবি থেকে পৃথক না হ'লেও, এখানে তাঁর কণ্ঠস্বর আরও দৃঢ়, প্রেরণা আরও সমুন্নত, এবং আকৃতি বা Passion আরও সংবৃত।

'পালা-বদল' পাঠকালে যে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হয় তা হ'ল, প্রথমতঃ—এই গতিময় জগৎ-সংসারে, নিত্য-পরিবর্তন ও অনিবার্য রূপান্তর সম্বন্ধে কবির তীব্র সচেতনতা; দ্বিতীয়তঃ—এ সকলের উর্ধ্বে এক অপরূপ চৈতন্যময় সত্তায়, এক আত্মিক সমুন্নতিতে কবির অবস্থান।

রূপ-জগতের নানা পরিবর্তন-অবস্থা-বিপর্যয় কবির চোখে ধরা পড়েছে; অগ্রসরমান জীবনের প্রেরণায় তাঁকে ছড়িয়ে পড়তে হয়েছে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। গ'ড়ে তোলা ঘর বার-বার ভেঙে গেছে না-গড়া অপরিচিত ঘরের বেদনায়; কিন্তু এর জন্য কোন হাহাকারের সুর পাই না তাঁর কবিতায়; কোনরূপ অহেতুক অভিযোগও তিনি করেন না, বরং এই অবশ্যম্ভাবীকে স্বীকার ক'রে নেন। এবং স্বীকার ক'রে নেন বলেই 'মধ্য মার্কিনে'র ধীম লাইনর, চলন্ত ট্রেন, গাছপালা, মাটি-মানুষ সকাল-সন্ধ্যা প্রভৃতি ছবির সঙ্গে তিনি আশ্চর্যভাবে মিলিয়ে দিতে, মিশিয়ে

দিতে পারেন চিরন্তন বাংলাদেশের মাটির ঘ্রাণ, বৃষ্টির শব্দ ও উজ্জ্বল রোদে আঁকা নিখুঁত ঘরকন্নার ছবি। অতি সাধারণ বস্তুও তখন তাঁর প্রবাসী মনের কাছে অসাধারণ আবেদনে দেখা দেয় :

"মধ্য মার্কিনে আছি মিসিসিপি পারে, চলেছি যে ঘড়ি হাতে
টিক্‌টিক্ আয়ু তার আনে ছিন্ন এটা-ওটা : খুঁজি নিঃসময়
কোন ঘটনার ছবি— বাংলাভাষায় গাঁথা— চিরক্ষণ যাতে
শাদা বক, ব্যস্তট্রেন, বুকে ধরে এই সকালের পরিচয়।" (সমাবর্ত)

অমিয় চক্রবর্তীর একটি তৃতীয় নয়ন আছে। এই 'নয়নে' তিনি প্রকাশের মধ্যে খোঁজেন অপ্রকাশ 'এক'-কে, বস্তুর অন্তরালে অনুসন্ধান করেন তার অন্তরাল, যার ফলে তাঁর সব চিত্রই সংগীত এবং সব সংগীতই মিষ্টিক।

অমিয় চক্রবর্তী ইম্প্রেসনিষ্ট কবি। 'পালা-বদলে' তিনি যে গান গেয়েছেন তা অতিক্রান্তির গান। এ গানের তাল-লয়-সম উচ্চগ্রামে বাঁধা। পড়তে গিয়ে বার-বার মনে হয়েছে, 'পালা-বদল' অপ্রস্তুত পাঠকের কাব্য নয়; সচেতন দরদী পাঠক ব্যতীত এর আবেদন গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

এক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। শুধু তাই নয়, অমিয় চক্রবর্তীই সাম্প্রতিক যুগের একমাত্র কবি যাঁর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার আদর্শ ও কায়া সাধনের মন্ত্র অতি সুসংযতভাবে উচ্চারিত হয়েছে। তবে এ উচ্চারণের ভঙ্গিটি তাঁর পৃথক। এই মৌলিকতা সুস্পষ্ট হয়েছে 'পালা-বদলে'র প্রেম ও মিষ্টিক কবিতায় —যেখানে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে একটি উপযোগী পরিমণ্ডল রচনা করেছেন।

'পালা-বদলে' যে কয়টি প্রেম ও বিরহের কবিতা রয়েছে সেখানে কবি উত্তরণের সংবাদই শুনিয়েছেন, দৈনন্দিন জীবনের গ্লানিকর আবহাওয়া থেকে তাদের মুক্তি দিয়েছেন এক অমেয় পূর্ণতার পরিতৃপ্তিতে। কারণ অমিয় চক্রবর্তীর স্বভাব রূপকে ছুঁয়ে নয়, স্বরূপকে ছুঁয়ে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে অমিয় চক্রবর্তী নীচু কণ্ঠে উঁচু কথা বলেছেন।

॥ খ ॥

'পালা-বদলে'র অন্য একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে— সংগতিসাধনে কবির দক্ষতা। হৃদয়ের সঙ্গে মননবৃত্তির এমন সুমিত সংগতি রক্ষা ও সাযুজ্যবোধ সচরাচর চোখে পড়ে না। তবে এই সাঙ্গীকরণই তাঁর কাব্যের চরম কথা নয়—একে কাব্যের পূর্বপক্ষ বলা যেতে পারে; আর এই পূর্বপক্ষের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে-হ'তে

রসিক পাঠকের মন যে প্রাপ্তিতে এসে পৌছয় সেই উত্তরপক্ষে কবি না emotional, না intellectual. সমস্ত সুর ও স্বর—রূপ ও ছবির নির্যাসে প্রতিপন্ন এক অখণ্ড, অমলিন, আনন্দময় সত্তায় তিনি তখন বিরাজমান। কতকটা স্বগতোক্তির মধ্য দিয়েই যেন তিনি তখন বলেন :

"দেখলাম চু-চক্ষু ভ'রে, হে প্রভু ঈশ্বর মহাশয়
চৈতন্যে প্রসন্ন সূর্য, ... (এপারে)

কবি দ্রষ্টা। তিনি চোখ খুলে দেখেছেন রূপময় জগৎকে ; সংসারকে—যে সংসার স'রে যায়, তাকে। এই দেখার ভিতর দিয়ে তাঁর প্রাণের দেহলীতে অলক্ষ্যে গ'ড়ে উঠেছে একলা-দেখা জগৎ ; যে জগতের অধিবাসী তিনি একা : এবং অধিকর্তা তাঁর প্রভু ঈশ্বর। যে মুহূর্তে এই আন্তর জগৎ সম্পর্কে কবির উপলব্ধি হয় সে মুহূর্তেই তিনি বেদনা পান ; এবং সবকিছু ছাপিয়ে সেই অখণ্ড 'এক'-কে (এখানে ঈশ্বর) অনুভব করতে পারেন। যখন কবির এই অনুভূতি হ'ল, তখন, ঈশ্বর সম্পর্কে কবির প্রাণে এক প্রত্যক্ষতা জাগলো। এই জাগরণে নিষ্ঠা ও দ্বিধা অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে রয়েছে। আর সেইজন্যই কবি দু'টি বৈষম্যমূলক কথা বলেছেন, "প্রভু" ও "মহাশয়"। মহাশয় কথাটির মধ্যে হাসির চেয়ে একটি অ-সৌখীন সারল্যই দেখতে পাই।

॥ গ ॥

'পালা-বদলে' এমন কয়েকটি কবিতা আছে যেখানে দিন শেষের সুর বেজে উঠেছে। দূরে ঘনায়মান সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে প্রবাসী কবির মন ঘুরে ফিরে কেবল ঘরের কথাই ভাবছে—শেষ বিকেলে তার সমস্ত প্রাণ জুড়ে যেন পালা-বদলের গানই গুঞ্জরিত হ'য়ে উঠেছে—

'এ দিকে পঞ্চাশ হ'ল দিন,
এ যাত্রার সন্ধ্যায় ক্রমে সন্নিক্ষণে হ'য়ে আসে ক্ষীণ
পালা-বদলের বেলা
মেলাবে কি যোগ অন্ধকারে
সৌর ধুলো তৈরি দেহ রাখি যবে ঘরে ফেরা বাঁশী
বহু পথ এসেছি তো ঘষ্টনে বাঙালী দূরবাসী ॥' (এপারে)

'পালা-বদলে'র কবিতাগুলোকে প্রধানত এই কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় (১) চিত্রধর্ম ও চিত্রকল্প। (২) মহান প্রেম ও বিরহের কবিতা ; (৩) সমুন্নত প্রেরণা ও আধ্যাত্মিকতা (৪) ঘরে ফেরার ডাক ও স্মৃতি-অনুষঙ্গ (৫) মধ্যজীবন সম্বন্ধীয়।

'পালা-বদলে'র শুরুতে কবি পূরবীর মতো গান ধরেছিলেন; শেষ করলেন ভৈরবীতে। এ ভৈরবী নব উদ্‌বেজনার ভৈরবী। 'পালা-বদল' গ্রন্থের একদিকে যেমন বিস্তার ধর্ম, অপরদিকে তেমনি গভীর তত্ত্ব। তবে এ তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বের মতো;—কেবল তত্ত্বই নয় সুরেলা কাব্যও বটে। কবির মধ্যে যেমন একজন সচেতন সমালোচককে পাই তেমনি একজন হৃদয়বান মরমীর পরিচয়ও মেলে।

অমিয় চক্রবর্তীর কাব্য প্রস্তুত পাঠকের আবিষ্কারের আনন্দ। তাঁর কাব্যের ভূমি কিছু উঁচু। সেখান থেকে তিনি তাঁর সহজ প্রসন্ন কণ্ঠস্বরে মর্ত জগতের জন্য অমর্ত সংগীতের ধ্বনি বোনেন। তাই তাঁর কাব্য বাচ্যার্থে নয়, ব্যঙ্গ্যার্থে। ভাষার থেকে বাণীই সেখানে প্রধান। কবি কিন্তু মর্ত জগৎকে তাই ব'লে অস্বীকার করেন না—বরং অতিক্রমনের বেদনায় এক পরিচ্ছন্ন উপলব্ধিতে নিজেকে সমুজ্জ্বল করে রাখেন, যার ফলে এই বস্তু পৃথিবীর সঙ্গে তিনি মিশতে চান কিন্তু নিজেকে মিশাতে চান না।

'পালা-বদলে'র কবিতাগুলোর প্রতিটি কবিতারই প্রথম পংক্তি, মনে হয়, এরও আগে কিছু ছিল; এই শুরুর আদিতে যেন অন্য কোন 'শেষ' আছে। এই আরও কিছু ও অন্য কোন শেষ; হচ্ছে পারাপারে ধ্বনি। এ ধ্বনি 'পালা-বদলে' এসে পরিপূর্ণ—পরিতৃপ্ত।

'পালা-বদলে'র অধিকাংশ কবিতায় কবি যে ছন্দ ব্যবহার করেছেন তাকে মিশ্র ছন্দ বা শংকর ছন্দ বলা যেতে পারে। তবে ছন্দের আলোচনা এখানে করছি না, তা পৃথকভাবে গবেষণার বস্তু।

অসীম সেনগুপ্ত

বাংলা ভাষার ভূমিকা ॥ শুদ্ধসত্ত্ব বসু। একক প্রকাশনী। মূল্য আড়াই টাকা।

বহতা নদীর মতো ভাষা জাতীয় জীবনে সঞ্চারিত হয় অজস্র ধারায়। সহজ গতিময় প্রাণধর্ম-ই তার সত্তার বৈশিষ্ট্য। ভাষাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার মধ্যেই তার সত্যিকার স্বীকৃতি। কিন্তু দুঃখের কথা, সাধারণতঃ সজীব ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায়, লেখক ভাষাতত্ত্বের কেতাবী পথ ধরেছেন। তাতে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য হয়ত প্রকাশ পায়, কিন্তু পাঠকের প্রাণ এদিকে ওষ্ঠাগত। ভাষাকে—তার সহজ চলমান ইতিহাস আর প্রাণসত্তাকে,—যিনি পাঠকের মর্মমূলে পৌঁছে দিতে পারবেন—বৈদগ্ধ্যের সম্মানিত আসন তিনি পান আর নাই পান,

সাধারণ পাঠকের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা তিনি নিশ্চয়ই লাভ করবেন। একথা অনেকদিন থেকেই আমার মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'বাংলাভাষা পরিচয়ে' ঐ পথের পুরোধা হয়েছেন। সংক্ষিপ্ত হ'লেও আলোচ্য গ্রন্থটি-ও ওই ধারারই আর একটি মূল্যবান্ সংযোজন।

ভাষাতত্ত্বের নীরসতা সম্পর্কে সাধারণের মনে যে এক ধরণের আতঙ্ক আছে, ঐ গ্রন্থপাঠে তা' অনেকখানি দূর হবে বলে আশা রাখি। ঘরোয়া মধুর অথচ বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গীতে লেখক বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে বহুমুখী আলোচনা করেছেন, তা কেতাবী পণ্ডিতগিরি'র দোষমুক্ত হ'য়েও পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট আনুকূল্য ক'রবে ব'লে আমার বিশ্বাস।

গ্রন্থকার নিজে একাধারে শিক্ষাব্রতী ও আধুনিক যুগের একজন খ্যাতনামা কবি। এই দুই সত্তার সমন্বয় এ গ্রন্থে হ'তে পেরেছে। আর তাই এখানে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে মৌলিক ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সংযোগ চোখে পড়ে। লেখক নিছক চর্বিতচর্বণ করেন নি, নিজে ভাষা ও ভাষাসমস্যা নিয়ে যথেষ্ট মৌলিক চিন্তাও করেছেন। আধুনিক বাংলাভাষা—তা'র শব্দসম্ভার, ইডিয়ম, প্রয়োগশুদ্ধি এই ধরণের আলোচনা—যেমন সরস, তেমনি মূল্যবান্ ও কালোপযোগী হয়েছে।

ঐ গ্রন্থের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নয়, একটি পরিশীলিত, আধুনিক রসিক মনের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাভাষাকে পর্যবেক্ষণ ও তার বিচার-প্রয়াস, রবীন্দ্রনাথের পর এমনটি আর হয়েছে ব'লে আমার মনে পড়ে না।

বইটি পাঠক ও ছাত্রসমাজে আদরণীয় হ'বে বলে আমি বিশ্বাস করি।

অধ্যাপক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

পত্ররাগ ॥ চিত্ত ভট্টাচার্য। একক প্রকাশনী। মূল্য দেড় টাকা।

পত্ররাগ তরুণ কবির কাব্যসংকলন। এই গ্রন্থে কবির বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছড়ানো কয়েকটি কবিতা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থে ভূমিকায় প্রথমেই কবি বলেছেন যে, 'আধুনিক কবিতার বেগবতী প্লাবন কল্লোলে এই কাব্য সংকলন হয়ত বাংলা কাব্যের সুবিস্তীর্ণ তটভূমির কোন স্থানেই পলির আস্তরণ না বিছিয়েই বিস্মৃতির সমুদ্রে অনেক ঢেউয়ের একটি হয়ে মিলিয়ে যাবে।'

কথার মধ্যে বিনয় আছে সন্দেহ নেই, তবু বলবো এ ধারণা যখন কবির ছিলই তখন সংকলনটির প্রকাশ আরও কিছু বিলম্ব ঘটলে পাঠক ও কবি উভয়েরই সুখী হবার কারণ থাকত।

কারণ কবিতা লেখা এককথা, আর কবিতাকে মর্যাদা দেওয়া অন্যতর কথা।

পত্ররাগ পড়ে মনে হল কবি অল্পকিছুদিন হল লিখছেন তাই কবিতাগুলোতে তাঁর জীবন-সন্ধিৎসা ও কাব্য-সচেতনতা সুপরিস্ফুট হয়নি। বর্তমান তরুণ কবিদের মধ্যে যে একটা গভীর বেদনাবোধ লক্ষ্যণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, পত্ররাগের কবিতাগুলিতেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। তবে এখানে সেই দুঃখবোধকে কবি সবজায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি বলেই বিশ্বাস;—দানা বেঁধে ওঠার আগেই কতকটা 'মেলোড্রামেটিক' ভাবে আশ্বাসের বাণী শুনিয়ে ভাবকে প্রখর করে ফেলেছেন। 'সাধের ব্যর্থতা ও স্বপ্নময় সুরের স্বীকৃতি' দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি অনেক জায়গায়। গদ্যাত্মক আংগিকের কবিতায় কোন কোন স্থানে কবি ছন্দের 'মেজার' ও তাল-লয় সম্বন্ধেও উদাসীন।

(এগুলি 'পত্ররাগে'র প্রথম কবিতা 'বাউল'-এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতি কিনা জানি না।)

অবশ্য পত্ররাগে কয়েকটি ভাল কবিতাও আছে;—যেমন, 'অন্তকোন আলো,' 'আস্থা রেখো হৃদয়ে,' 'সেইটেই বড় কথা,' 'সব নদী নারীর শরীর,' 'বারণ,' 'ব্রতী করো,' 'পরিবর্তন হলে ভাল হত' ইত্যাদি। তবে এগুলির মধ্যে আরও প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। 'একটি সংবাদ' কবিতাটির স্থান নির্বাচন বোধ হয় যথাযথ হয়নি এবং কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আনবার চেষ্টাও সবল হয়নি।

কবির প্রকাশভংগির মধ্যে কোন জড়তা নেই; এবং কোন উগ্র আধুনিকতার সচেষ্ট প্রয়াস নেই। তিনি কাব্যধর্মকেই বড় বলে মেনেছেন। এটা সুখের কথা, আশার কথা। কবির উপর আমরা আস্থা রাখি। মনে করি গভীর উপলব্ধি ও পরিমিত সমীক্ষায় তাঁর ভবিষ্য কবিতাগুলি স্থায়ী হতে চেষ্টা করবে।

অসীম সেনগুপ্ত

ASUTOSH COLLEGE STUDENTS' UNION

SESSION 1955-1956

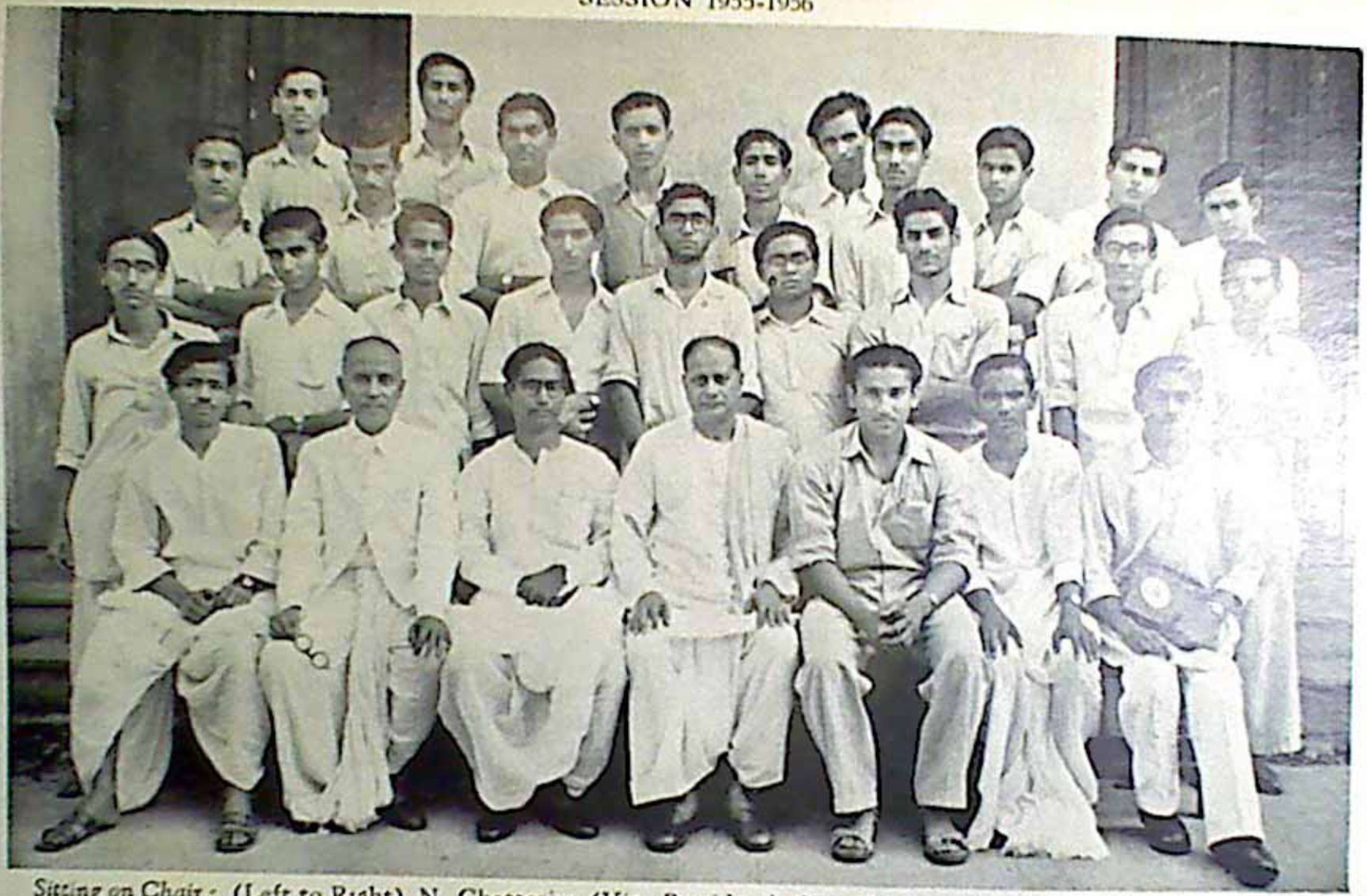

Sitting on Chair : (Left to Right) N. Chatterjee (Vice-President), Vice-Principal R. K. Sircar, Prof. K. C. Maity (President), Principal S. P. Mukherjee, P. Dutt (General Secretary), P. Ghosh (Games Secretary), T. Dhar (Debate Secretary).

Standing below (Left to right) : G. Bhattacharjee (Cultural Secretary), D. Mukherjee, A. Bhattacharjee, A. Gangully (Asst. Games Secretary), M. Chatterjee (Secretary Wall-paper), N. Bose, S. Palit, S. Roychowdhury, A. Sengupta, (Magazine Editor).

Standing Middle Row (Left to Right) : N. Das, A. Banerjee, S. Ghosh, K. Ghosh, G. R. Gangully (Common Room Secy.), D. Banerjee (Poor Fund Secy.), G. Guha, A. Maitra, D. P. Dasgupta.

SESSION 1955-1956

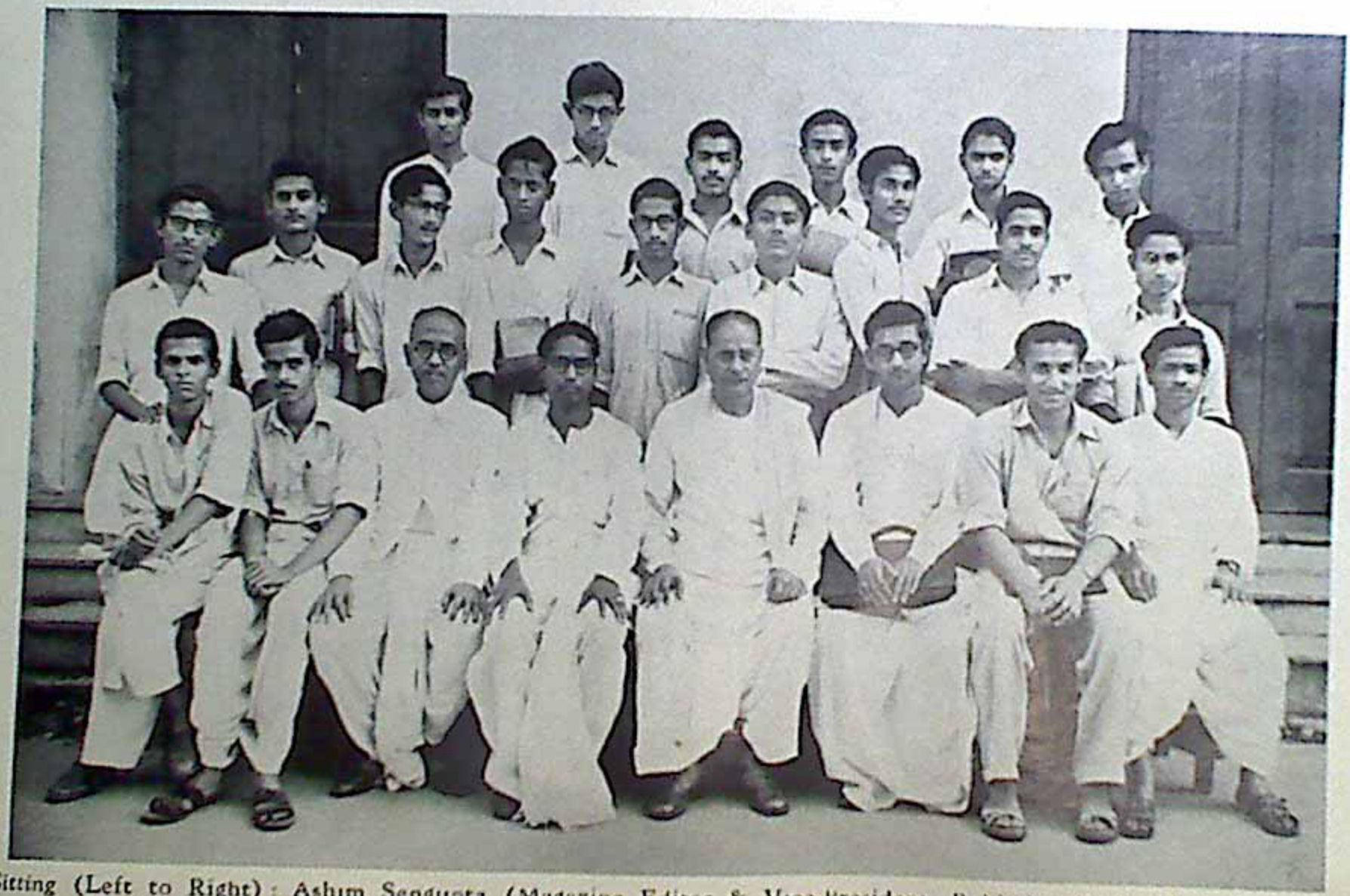

Sitting (Left to Right) : Ashim Sengupta (Magazine Editor & Vice-President, Rabindra Patha-Chakra), Akhil Banerjee ; Vice-Principal R. K. Sarkar ; Prof. K. C. Maity (President, Students' Union) ; Principal S. P. Mukherjee ; Prof. S. K. Banerjee (President, Rabindra Patha-Chakra) ; Provat Kumar Dutt (General Secretary, Students' Union) ; Nirmal Chatterjee (Gen. Secretary, Rabindra Patha-Chakra).

Standing (Front Row Left to Right) : Shyamalendu Banerjee (Lipika Editor) ; Indrajit Sen ; Pronab Chatterjee ; Kalyanasish Das Gupta (Asst. Secretary) ; Dilip Gupta ; Binayak Roy ; Manab Chatterjee ; Rameswar Hazra ; Kanti Ranjan Chakravarty.

প্রতিবেদন

রবীন্দ্র-পাঠচক্র

রবীন্দ্র পাঠচক্রের পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আজ থেকে দশ বছর আগে (১৯৪৬ সালে) আমাদের পূর্বসূরী কয়েকজন ছাত্রের আন্তরিক সাহিত্যানুরাগ থেকেই জন্ম হয়েছিলো রবীন্দ্র পাঠচক্রের।

রবীন্দ্র পাঠচক্র আশুতোষ কলেজের একমাত্র সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান। গত দশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নানা প্রতিকূল ও অনুকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-পাঠচক্র আপন গতিতে এগিয়ে চলেছে তার ক্রমভাস্বর অধ্যায় রচনার পথে।

এই পাঠচক্রের কাজ হলো মূলতঃ সাহিত্য সভার মাধ্যমে ছাত্র-বন্ধুদের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠের ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নির্দ্ধারিত বিষয়ের উপর তাঁদের আলোচনার আয়োজন এবং সাহিত্য-সম্মেলন আহ্বান করা। এ ছাড়া রবীন্দ্র পাঠচক্রের আর একটি কাজ হলো প্রাচীর-পত্র 'লিপিকা' প্রকাশ করা।

এবারে গ্রীষ্মের ছুটীর কিছু আগে আমরা বর্ত্তমান বছরের কাজের ভার পাই। বিদায়ী সভ্যবন্ধুদের কাছ থেকে কাজের ভার বুঝে নিতে নিতে এবং সবকিছু নতুন করে সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলতে তুলতেই গ্রীষ্মের ছুটী এসে গেলো। তবু তারই মধ্যে আমরা কয়েকটি—আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলাম : এবং সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেখানে আলোচনাও করা হয়েছে।

অনুষ্ঠিত একটি উল্লেখযোগ্য সভার কথা বলি। এটি রবীন্দ্র-পাঠচক্রের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। স্মরণীয়ও বটে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ শ্রীসোমেশ্বর প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন কলেজের প্রাক্তন-ছাত্র কবি-সমালোচক শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু মহাশয়। শ্রীবসু তাঁর ভাষণে আধুনিক কবিতার গতি-প্রকৃতি, চিত্রকল্প, প্রকরণ, বুদ্ধিধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। এ দিনের সভায় অধ্যাপক শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী ও অধ্যাপক শ্রীবিমল সমাদ্দার মহাশয়ও তাঁদের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। এইদিন ছুটোর পর কলেজ ছুটী দেওয়া হয়। আশুতোষ কলেজের তিনটি বিভাগের (সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা) অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী এই সভায় যোগদান করেন। বিভিন্ন বিভাগের প্রায় অধিকাংশ

অধ্যাপকই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এ দিনের সভা আমাদের মধ্যে বৃহৎ অনুপ্রেরণা এনে দিয়েছে। এরজন্য আমরা শ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিনায়ক রায়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমাদের মুখপত্র 'লিপিকা' তার পূর্ব সাধকদের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে বলেই বিশ্বাস। তাকে রেখা-লেখায়, ভাব মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ করে তুলতে যাঁরা অসামান্য পরিশ্রম করেছেন সেই সম্পাদকদ্বয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। 'লিপিকা'র বর্তমান সম্পাদক শ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

কলেজ খুললে আমরা আমাদের কাজের পরিকল্পনাকে রূপ দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। কিন্তু সবকিছুর উর্ধ্বে সহযোগিতা। বারবার বলেছি এবং আবারও বলি—"রবীন্দ্র পাঠচক্র কেবলমাত্র সভ্যদের জন্যই নয়, আসলে এটা আশুতোষ কলেজের সাহিত্যানুরাগী প্রতিটি ছাত্রের বিশেষ প্রতিষ্ঠান। একথা মনে করলেই তো সব কথা মিটে যায়।

আর শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকদের প্রতি আমাদের একান্ত আবেদন যে, তাঁরা যেন রবীন্দ্র-পাঠচক্রের জন্য একটু চিন্তা করেন।

সবশেষে আমাদের এ বছরের পরিচালকমণ্ডলী ও সভ্যদের নাম উল্লেখ করে বিদায় নিচ্ছি।

প্রধান উপদেষ্টা—অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সহঃ সভাপতি—শ্রীঅসীম সেনগুপ্ত। সম্পাদক—শ্রীনির্মল চট্টোপাধ্যায়। সহঃ সম্পাদক—শ্রীকল্যাণাশীষ দাশগুপ্ত। 'লিপিকা' যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীশ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীভূপেশ চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য সভ্যবৃন্দ—শ্রীপ্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিনায়ক রায়, শ্রীকান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীদিলীপ ভাদুড়ী, শ্রীইন্দ্রজিৎ সেন, শ্রীরত্নেশ্বর হাজরা, শ্রীপ্রভাত দত্ত, শ্রীমানবেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীতপন গুহঠাকুরতা, শ্রীমানবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ গুপ্ত, ও কমলকান্তি বসু।

ইতি—

রবীন্দ্র-পাঠচক্রের সভ্যবৃন্দ

প্রতিবেদন

কমনরুম

নববৎসরে নব উৎসাহে যখন কমন্‌রুমের কার্য্যভার গ্রহণ করলাম তখন সেটা ছিল জানুয়ারী মাস। এই গুরু দায়িত্ব বহন করা আমার পক্ষে কষ্ট সাধ্য হবে জেনেও নিজের অপটুতার দিকে বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করে কাজে হাত দিলাম।

কমন্‌রুমের আবহাওয়ার সঙ্গে দিন দু'য়েকের মেলামেশার মধ্যে বুঝতে পারলাম যে, ছাত্রদের খেলা এবং বই গ্রহণের ব্যাপারে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। তাই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কমন্‌রুমে ক্যারামবোর্ড আনবার এবং টেবিলটেনিস্ বোর্ডটাকে সম্পূর্ণভাবে মেরামত করার ব্যবস্থা আমরা করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিনিষও ভুললাম না। সেটা হ'ল এই সমস্ত জিনিষগুলোকে পরিচালনা করা।

এবার আসা যাক বইয়ের ব্যাপারে। কলেজের ছাত্রদের মত ও পরামর্শ অনুযায়ী যতগুলি সম্ভব বই কেনা হয়েছে। তাছাড়া কিছু অতিরিক্ত বইও কেনা হয়েছে। বর্ত্তমানে কমন্‌রুমে বইয়ের সংখ্যা প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি। এরপর আরও কিছু বই কেনা হ'লে আশা করা যায়, ছাত্রদের কিছু সুবিধা হ'বে।

আমরা আশা রাখি যে, প্রতিবারের মত এবারও Inter-section Indoor-games Competition খুব সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদিত হ'বে এবং ছাত্রেরাও বেশ পারদর্শিতা দেখিয়ে কলেজের খ্যাতি বর্দ্ধন করবে। এই প্রসঙ্গে দুঃখের সহিত একটি কথা বলতে বাধ্য হ'লাম। অন্যবার আমাদের কলেজ Inter-College Indoor-games Competitionএ নাম দেয় এবং কৃতিত্ব প্রকাশ ও না করে এমন নয়। কিন্তু এবার আর তাতে আমরা entryই করতে পারলাম না; কারণ University থেকে আমরা কোন খবরই পাইনি। প্রত্যেকবারই তাঁরা খবর পাঠান, কিন্তু এবার যে তাঁরা কেন পাঠালেন না তা বুঝলাম না।

পরিশেষে উল্লেখ করা দরকার যে, আমাদের কলেজের ছাত্রসংখ্যা অনুযায়ী কমন্‌রুমের আকার পর্য্যাপ্ত নয়, এবং ফলে আমাদের নানান দিক দিয়ে বড় অসুবিধা ভোগ করতে হয়। সেইজন্য আমরা কলেজ-কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তাঁরা যেন কমন্‌রুমের স্থানাভাবের বিষয়টি একটু বিবেচনা ক'রে দেখেন। কারণ একই ঘরে খেলাধুলা ও পড়াশুনা করা কখনো সম্ভব নয়; তাতে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টির প্রতি আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীগৌরারেণু গঙ্গোপাধ্যায়
(কমন্‌রুম সম্পাদক)

বিতর্ক সংবাদ

এই বৎসর কার্যভার হাতে পাইবার প্রথম হইতেই আমরা প্রায়শঃই আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতার জন্য আমন্ত্রণ পাইতে থাকি। যদিও উপযুক্ত বক্তা নির্বাচনের অভাবে প্রত্যেকটি প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজের প্রতিনিধি পাঠাইতে পারি নাই। তথাপি এই পর্যন্ত আমরা "শরৎ বসু একাডেমি", "বি. ই. কলেজ", "অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও" কর্তৃক আহূত হইয়া আমাদের বিতর্ক পরিষদের কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে সক্ষম হইয়াছি।

আমাদের কলেজের প্রতিনিধি শ্রীদীপ্তিপ্রসাদ মিত্র "ইণ্ডিয়া টুমরো" ক্লাব পরিচালিত ইউনিভার্সিটি হলে অনুষ্ঠিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলেজের সুনাম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অন্যান্য প্রতিযোগিতাগুলিতে আমরা সাফল্যলাভ না করিতে পারিলেও আমরা ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশা পোষণ করি।

কলেজে আমরা মাসিক বিতর্ক অধিবেশনের আয়োজন করিয়াছি; কিন্তু ছুটির বহুলতায় নিয়মিত অনুশীলনের সমধিক ব্যাঘাত ঘটিতেছে। ইতিমধ্যে যে কয়টি বিতর্ক সভার আয়োজন হইয়াছে, তাহাতে ছাত্রদের সবিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। আশা করা যায় যে, আজকালকার এই পার্লামেণ্টারী শাসনতন্ত্রের যুগে ছাত্রগণ বিতর্ক সভার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আগামী অধিবেশনগুলিতে আরও উৎসাহের সহিত যোগ দিবেন।

এই প্রসঙ্গে ছাত্র বন্ধুদের আর একটি অনুরোধ করি, তাহারা যেন ইংরেজিতে ভাষণ দেওয়া অনুশীলন করেন। কারণ, দেখা যাইতেছে, অধিকাংশ বিতর্কেই ইংরেজির গুরুত্ব বেশী। পরিশেষে এই বিতর্ক সভা সম্পর্কে আমাদের বিতর্কাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহ, যত্ন ও উদ্যম সর্বদার তরে আমাদের মনে উদ্দীপনার সঞ্চার করে। তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি। শুভেচ্ছান্তে—

তপনকুমার ধর
ডিবেট্ সেক্রেটারী

নূতন ছাত্রাবাস

শৈশবের প্রাথমিক শিক্ষাকে অতিক্রম করে আমরা ধীরে ধীরে মহাবিদ্যালয় জীবনে প্রবেশ করি। এখানে লাভ করি জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী স্বাধীনতা ও প্রচুর অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা আরও গভীর হয় যদি আবাসিক জীবনের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটে। আমাদের এই ছোট্ট ছাত্রাবাসে কয়েক বছর কাটিয়ে আমি সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছি।

ছাত্রাবাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ না দিয়ে এক কথায় বলবো যে, সকল রকম দোষ ত্রুটি যথাসম্ভব এড়িয়ে শৃঙ্খলা ও ভ্রাতৃত্বমূলক পরিবেশের মধ্যে আমাদের ছাত্রাবাসটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। এর মূলে যাঁর আন্তরিক যত্ন ও সস্নেহ দৃষ্টি আছে সেই শ্রদ্ধেয় অধীক্ষক শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে।

ছাত্রাবাসে অনুষ্ঠিত পর্ব্বগুলি প্রতি বছরের ন্যায় এবারও যথাযথ উদ্‌যাপিত হ'য়েছে। ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস, ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষ জয়ন্তী প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি আমরা সুষ্ঠুভাবে সমাধা করেছি। অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে স্বরস্বতী পূজা। সকলের চেষ্টায় আমরা ভারতীর অর্চনাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছি। সেই সুসজ্জিত পূজামণ্ডপ ও আনন্দমুখর দিনটি আমাদের মনে রেখাপাত করে আছে। কিন্তু সকল আনন্দের মধ্যে ডাঃ মেঘনাদ সাহার মহাপ্রয়াণের সংবাদে আমরা মর্ম্মাহত হ'য়ে সেদিনের সঙ্গীতানুষ্ঠান বন্ধ রেখেছিলাম।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও পূজার পরের দিন প্রাক্তন আবাসিকগণের পুনর্মিলন উৎসব হয়েছিল। এই বৎসরে প্রাক্তন ছাত্র শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের দরদভরা গান শুনে আমরা মুগ্ধ হ'য়েছি।

গত বছরের বড়দিনের ছুটীতে আমরা দীঘার সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণ ক'রে প্রচুর আনন্দ ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। এবছরেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। ছাত্রাবাসের অধীক্ষক শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য্য এবং আবাসিকগণের সমবেত চেষ্টায় ও উৎসাহে আমরা দুর্গাপুর ভ্রমণে সক্ষম হ'য়েছিলাম। আমাদের এই অভিযানে অধ্যক্ষ শ্রীসোমেশ্বরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সহ-অধ্যক শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার, অধ্যাপক শ্রীশিবনাথ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীকান্তীশ মাইতি, অধ্যাপক শ্রীশিশিরকুমার দাস ও অধ্যাপক শ্রীবিদ্যুৎকুমার

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়দের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। তাছাড়া কয়েকজন প্রাক্তন আবাসিক আমাদের সঙ্গে যোগদান করে আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করেছিলেন। আমরা দুর্গাপুরে দুদিন মাত্র অবস্থান করেছিলাম। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, ব্যারেজ, দামোদর ব্রিজ, বন ও খাল পরিকল্পনা দেখে আমরা যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছিলাম। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলাম বিরাট ব্যারেজের নির্মাণ কৌশল দেখে। এই অভিযানের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করেছে শ্রীসুনীলকুমার সেনগুপ্ত ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী ইন্দিরা সেনগুপ্তার সাহায্য ও চেষ্টার উপর। এই জন্য আমরা তাঁদের কাছে ঋণী। অভিযান পরিচালনার দিক থেকে শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ দাস মহাপাত্র ও শ্রীনবকুমার করের প্রয়াসকে সাধুবাদ না দিয়ে পারি না।

খেলাধুলার বিষয়ে এবারও আমাদের ছাত্রাবাস স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। এ বছরে কোন উল্লেখযোগ্য ফল না হলেও ক্রীড়া সম্পাদক শ্রীঅনিত কুমার মুখোপাধ্যায় নিয়মিতভাবে তাঁর কার্য্য সম্পন্ন করেছেন। পরবর্ত্তী বন্ধুগণ এ বিষয়ে আরও উন্নতি লাভ করবেন—এই আশা রাখি।

ছাত্রাবাসের ছোট্ট পাঠাগারটিতে এবছরে কিছু কিছু বই বৃদ্ধি করা হয়েছে। শ্রীনীলাঞ্জন বসু আমাদের পাঠাগারকে কয়েকটি বই উপহার দিয়েছেন। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীঅরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য সুষ্ঠুভাবে তাঁর কার্য্য সম্পাদন করেছেন। এর জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ছাত্রাবাসের গত বছরের ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার ফলাফল মোটামুটি ভালই। বি. এ., বি. এস. সি পরীক্ষার্থীদের প্রায় সকলেই ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন "ডিসটিংক্শন্" পেয়েছেন। আই. এ ও আই. এস. সি. পরীক্ষার্থীদের মধ্যেও অধিকাংশই উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সাফল্য আরও বেশী হবে।

ছাত্রাবাসের সকল প্রকার উন্নতির মূলে রয়েছেন অধীক্ষক শ্রীনীরদ কুমার ভট্টাচার্য্য। আবাসিক জীবনের উন্নতির দিক থেকে তাঁর অকুণ্ঠ প্রয়াসের জন্য আমরা তাঁর কাছে চিরদিন ঋণী থাকব। তা'ছাড়া কলেজের সভাপতি শ্রীরমা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যক্ষ শ্রীসোমেশ্বর প্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমাদের উপর সর্ব্বক্ষণের জন্যই তাঁদের সস্নেহ ও সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। এঁদের সকলকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আর যে সমস্ত বন্ধুগণ বি. এ, বি-এস. সি. এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তাঁরা সফল হোন এই কামনা করি।

পরিশেষে আমাদের ছাত্রাবাসটি সব দিক দিয়ে উত্তরোত্তর উন্নত হোক এই কামনা ক'রে এইখানেই শেষ করি।

ইতি—

শ্রীমোহিতকুমার কুণ্ডু

পুরাতন ছাত্রাবাস

বিচিত্র কর্ম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে একটা মহৎ উদ্দেশ্যকে জীবনে ফুটিয়ে তোলাই হ'ল শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ। আমাদের ছাত্রাবাসের সমষ্টি জীবন এই উদার আদর্শ অনুসরণে নানা ভাবে আমাদের সাহায্য করে। আমরা মাত্র তিন চার মাস আগে এই ছাত্রাবাসের কৃষ্টি পরিষদের ভার গ্রহণ করেছি। এই অল্প সময়ের মধ্যে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে আমাদের আবাসিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী এখানে দিতে চেষ্টা করছি।

আলোচ্য কালের প্রথম ভাগেই ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভের স্মৃতিদিবস উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন ভোর ৫টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়, সন্ধ্যায় ছাত্রাবাসের গৃহটি দীপমালায় সজ্জিত হয়। তারপর একে একে এসেছে ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী জন্মদিবস, ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস, ৩রা ফেব্রুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই স্মরণীয় দিনগুলি আমরা সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করেছি। ছাত্রাবাসের এই অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্বদাই একটা শান্ত, সংযম ও গাম্ভীর্য্য, একটা অনাড়ম্বর সৌষ্ঠব ও নিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের অধীক্ষক মহাশয়ের উৎসাহ ও সুনিপুণ পরিচালনা এবং ছাত্রাবাসের প্রত্যেক ছাত্রের ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টার ফলেই এই অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে আমরা সাফল্যের সহিত আমাদের ছাত্রাবাসের পুরাতন ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি।

আমাদের আবাসিক জীবন এবৎসর কেবল একটা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও উৎসবের মধ্যেই কাটে নাই; আমাদের সমষ্টি জীবনে শোকের ছায়াপাতও হয়েছে। এ বৎসর আমাদের কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক হীরেন সেন ও অধ্যাপক ডাঃ অজিত মুখোপাধ্যায় অকালে পরলোক গমন করেছেন। এই উপলক্ষে আমরা ছাত্রাবাসের কমনরুমে সমবেত হ'য়ে শোকার্ত হৃদয়ে তাঁদের স্বর্গত আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছি। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ মেঘনাদ সাহা, বিচারক বিজন বিহারী মুখোপাধ্যায়, আচার্য্য নরেন্দ্র দেব, লোকসভার অধ্যক্ষ মবলঙ্কারের

মৃত্যু সংবাদ পেয়েও আমরা শ্রদ্ধানম্রচিত্তে তাঁদের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করেছি।

এবার আমরা কয়েকটি বিতর্ক সভার আয়োজন করেছিলাম। আবাসিকগণের সক্রিয় সহযোগিতায় এই বিতর্ক সভাগুলি আমাদের জীবনে একটা মনোরম বৈচিত্র্য ও প্রাণের চাঞ্চল্য এনে দিয়েছে। আর একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান আমাদের এই সংযমকঠোর জীবনের চারিপাশে একটি আনন্দ ও সজীবতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। U. S. I. S. আমাদের আবাসিকদের সহিত সহযোগিতা করে কয়েকটি শিক্ষামূলক ছবি দেখিয়ে আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছেন। এইজন্য আমরা U. S. I. S. কর্তৃপক্ষকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আবাসিকদের মধ্যে মৌলিক চিন্তা বিকাশের সুযোগ দেওয়ার জন্য আমরা প্রতি বৎসরই একটি ছাপা পত্রিকা প্রকাশ করি। এবারের পত্রিকাও তার বিচিত্র রচনা সম্ভার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ছাত্রাবাসের পুরাতন ঐতিহ্যকে অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে।

আবাসিকেরা পড়াশুনা ছাড়া অন্যক্ষেত্রেও যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এসম্পর্কে প্রথম উল্লেখ করতে হয় চতুর্থবর্ষের বিজ্ঞানের ছাত্র প্রনব মজুমদার ও দুর্গাশঙ্কর চ্যাটার্জীর কৃতিত্বের কথা। প্রণব মজুমদার কলেজের তবলা প্রতিযোগিতাতে প্রথম স্থান অধিকার করে আমাদের ছাত্রাবাসের মুখ উজ্জল করেছেন। দুর্গাশঙ্কর চ্যাটার্জী ও সামাজিক সেবায় যোগদান করে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

প্রতিবৎসরের ন্যায় এ বৎসরও আমরা শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিলাম—আর করেছিলাম এই ২৫শে জানুয়ারী তারিখে। আমাদের কলেজের পূজনীয় অধ্যক্ষ, সহাধ্যক্ষ ও অন্যান্য অধ্যাপকবৃন্দের সহযোগিতায় ও আমাদের ছাত্রাবাসের অধীক্ষক মহাশয়ের পরিচালনায় আমাদের এই ভ্রমণ সকল হ'য়ে ওঠে। ঐদিন ভোর থেকেই আমাদের ছাত্রাবাসের আবাসিকদের মধ্যে বেশ একটা সাড়া পরে যায়। আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল পানিহাটী। সেখানকার জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রলোক গঙ্গার তীরে তাঁর মনোরম বাগান বাড়ীটি ব্যবহার করতে দিয়ে ও নানাভাবে সাহায্য করে আমাদের যথেষ্ট উপকার করেছেন। এজন্য ছাত্রাবাসের প্রত্যেক আবাসিকই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। পানিহাটী জায়গাটা যদিও কলকাতা থেকে বেশীদূর নয়, তবুও কলকাতার একঘেয়ে জীবনে একটু বৈচিত্র্য আমাদের পক্ষে যথেষ্ট বলেই মনে হয়। সেখানে সারা দিন খেলাধুলা ও সর্বশেষে ভুরি ভোজনের দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করে আমরা ঐ দিনের ভ্রমণ সূচি সমাপ্ত করি।

এর পর এল আবাসিকদের সবচেয়ে আকাঙ্খিত উৎসব সরস্বতী পূজা। এই পূজা আমরা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে ছাত্রাবাসের বৈশিষ্ট্যকে পুরাপুরি ভাবে বজায় রাখতে পেরেছি। এই সাফল্য প্রমাণ করে দেয় আমাদের ছাত্রাবাসের প্রাক্তন ও বর্তমান আবাসিকদের সক্রিয় সহযোগিতার ও অধীক্ষক মহাশয়ের কর্ম্মতৎপরতার কথা। সত্যিই প্রাক্তন আবাসিক শান্তিদার প্রচেষ্টা আমাদের চিরদিন স্মরণ থাকবে। আশা করি, ছাত্রাবাসের প্রতি তাঁর এই দরদ থেকে ভবিষ্যৎ আবাসিকেরাও বঞ্চিত হবে না।

খেলাধুলার ক্ষেত্রেও আমাদের নৈপুণ্য কম নয়। ফুটবলে আমরা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নিউ হোষ্টেলের ছাত্রদিগকে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছি। পরাজিত হলেও নিউ হোষ্টেলের আবাসিকদের মধ্যে খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির কিছু মাত্র অভাব হয় নাই। এটা তাদের পক্ষে মস্ত গৌরবের কথা। আশা করি ভবিষ্যৎ আবাসিকদের মধ্যেও এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন হবে না। আমাদের ছাত্রাবাসের আন্তবার্ষিক ফুটবল প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। এতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে চতুর্থ বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রেরা। ভলিবল ও ক্রিকেট খেলাতেও আমরা যথেষ্ট উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছি।—কলেজের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতেও আমাদের আবাসিকেরা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

ছাত্রাবাসের কমনরুমে প্রতিবারের ন্যায় এবারও ক্যারম প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। চরম পর্য্যায়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করেন চতুর্থবর্ষের প্রণব মজুমদার, ২য় স্থান অধিকার করেন ৪র্থ বর্ষের জিতেন্দ্রনাথ অধিকারী। ছাত্রাবাসের ছোট গ্রন্থাগারটি কমনরুমের একটি অংশ। অধিক সংখ্যায় সাপ্তাহিক, মাসিক ও দৈনিক পত্রিকা রেখে আমরা আমাদের ছোট গ্রন্থাগারটির কলেবর বাড়াবার চেষ্টা করছি। কিন্তু একে যথাযথ রূপ দিতে গেলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, বর্ত্তমানে তা আমাদের নাই। তাই এ বিষয়ে আমরা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বর্ত্তমান বৎসরে আমাদের আবাসিকদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন সকলে পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারেন।

শ্রীমাণিকচাঁদ ব্যানার্জ্জী
সম্পাদক, কৃষ্টি পরিষদ

সম্পাদকীয়

আশুতোষ কলেজ পত্রিকার একত্রিশ বছর পূর্ণ হ'ল। গত ত্রিশ বছর আমাদের পূর্ব-সাধকেরা তাঁদের একনিষ্ঠ কর্মপ্রেরণার মধ্য দিয়ে পত্রিকার যে উজ্জ্বল ঐতিহ্য রচনা করে এসেছেন, তাকেই অবলম্বন করে কাজ সুরু করেছিলাম; অবশেষে অনুরাগী পাঠক ও ছাত্র বন্ধুদের হাতে পত্রিকার বর্তমান সংখ্যা তুলে দিতে পেরে ধন্য হয়েছি—সুখী হয়েছি॥

অহেতুক প্রথা আছে তাই সম্পাদককে দু'চার কথা বলতে হয়। আমি মনে করি, সম্পাদকের বক্তব্য পত্রিকা-প্রকাশনার মধ্যেই জড়িয়ে থাকে। নতুন করে কিছু না বললেও চলে। যদি কিছু থেকে থাকে, তা হ'ল আড়ালের খবর: প্রকাশের পর্দা সরিয়ে পাঠককে অপ্রকাশের এলোমেলো-অগোছাল স্থানটিতে উঁকি দিতে সাহায্য করা॥

শিল্প সৃষ্টিতে একটা অন্তরাল থাকে। এই অন্তরাল অনুসন্ধান করার মধ্যে রসবেত্তার পরিচয় আছে সন্দেহ নেই, তবে সাধারণ্যে তার প্রকাশ সব সময়ে রুচিকর নাও হতে পারে। সেই আশংকায় পত্রিকার আড়ালের খবর খুব বেশী দিতে চাই না; বরং স্বগতোক্তির মধ্য দিয়েই কিছু বলার চেষ্টা করবো। এতে পাঠকও খুশী হবেন: আমার কথাও ফুরোবে॥

স্বাভাবিক বিষয় নিয়ে এবারও আমরা অনেক লেখা পেয়েছিলাম। এবং বলা বাহুল্য কবিতার সংখ্যাই বেশী। গল্প-প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রচুর না হলেও কম নয় মোটেই। তবে সংখ্যাধিক্যের কথা তুলে লেখাগুলোর উৎকর্ষ প্রমাণ করার চেষ্টা করবো, এমন কথা বলি না। কারণ সংখ্যার সংগে মানের যে কোন সম্পর্ক নেই একথা কারও অজানা নয়। এই লেখাগুলোর সব-কটিরই প্রশংসা করতে পারলে আমি সুখীই হতাম॥

ভাল লেখা যে পাইনি তা নয়। বিশেষতঃ কবিতার কথা বলতে পারি যে, এবারকার পত্রিকায় কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা আছে। আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে যাঁদের উচ্চকণ্ঠে জেহাদ ঘোষনা আমাদের কানে বাজে, তাঁদেরও এ কবিতা ক'টি ভাল লাগবে বলে আশা করি। কাব্যের মূলধর্ম বজায় রেখে, তাকে সাম্প্রতিক আবহাওয়ায় এনে এবং তার সংগে একটা সহজ সংগীতের সুর-স্পন্দন যোগ করে এই কবিতাগুলো যেন রচনা করা হয়েছে। এতে সমীক্ষার সংগে সংগে আবেগ ও অনুভূতি একই

ধ্বনি তুলেছে। এই তরুণতম কবিদের উপর ভরসা রাখি। প্রাপ্ত লেখায় প্রাপ্তব্য লেখকের সন্ধান পাওয়া সত্যিই আনন্দের কথা॥

গল্পের কথায় আসতেই প্রথমেই বলতে হয় যে, এবারে খুব ভাল গল্প পাইনি। অধিকাংশ গল্পের মধ্যেই অত্যন্ত কাঁচা হাতের ছাপ। সংগতি ও পরিমিতি বোধের অভাব। ভাষাও কতগুলোতে নীরস ঠেকেছে। সবচেয়ে বড় কথা হল, ছোট গল্পের যে শাণিত চাতুর্য, যে তীক্ষ্ণ ভাষণ ও সংহত পরিবেশ গল্পের একটি বিশেষ "মুড"কে ক্লাইম্যাক্সে তুলে আনে, তা অনেকেই রক্ষা করতে পারেন নি, দেখলাম। দুঃখের ব্যাপার কিনা সেকথা থাক্, তবে এতে যে রসের ভাগে টান পড়ে এ কথাই বুঝি। তবু তার মধ্য থেকে কয়েকটি গল্প বেছে দেওয়া গেল। এগুলির মধ্যে প্রতিশ্রুতি আছে, নিষ্ঠা ও সহানুভূতি আছে। মনে হয়, গল্প ক'টি ভালই লাগবে॥

প্রবন্ধ ও ভ্রমণ কাহিনীর কথা দিয়ে এ প্রসংগ শেষ করছি। এবার যে প্রবন্ধ ছাপানো হল তা মোটামুটি ভালই বলতে হবে। গুরু-গম্ভীর চালে ও হালকা মেজাজে লেখা দু'রকমের প্রবন্ধই স্থান পেয়েছে। সাহিত্যে গতি ও অবগতি দু'টোই যে বড় কথা, চলতি কালের চাঞ্চল্য ও চিরকালের স্তব্ধতা কোনটাই যে ফেল্‌না নয়, এই উপলব্ধির সূক্ষ্ম ভাষণ মিলবে কয়েকটি প্রবন্ধে॥

যে প্রাণ ছড়িয়ে থাকে চেনা লোকের ভিড় ছাড়িয়ে দূরের নগরে-নগরে ; নদ-নদী-পাহাড়ে-বন্দরে, সে মনের মানুষই ভ্রমণ করে : নিরাসক্ত হ'য়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় পৃথিবীর মাঠ ঘাট,—পথ-প্রান্তর। তার কথাই কাহিনী ; আর সে কাহিনীই আমাদের নিভৃত অবকাশকে জড়িয়ে নিয়ে যায় তার নিজস্ব পরিক্রমায়। প্রকাশিত তিনটি ভ্রমণ কাহিনী পড়ে একথাই মনে হয়েছে। খণ্ড খণ্ড পরিবেশগুলোকে একই সমুন্নত প্রেরণায় বিধৃত করে একটা বৃহত্তর পটভূমি রচনার প্রচেষ্টা এই কাহিনী তিনটিকে হৃদয়গ্রাহী করেছে বলেই বিশ্বাস।

মোট কথা এ সবগুলো নিয়ে যে পত্রিকাটি প্রকাশ পেল, তা ভালই হয়েছে, আমি একথাটাই বলার চেষ্টা করছি।

সবই হ'ল। এখন যাঁরা পড়বেন তাঁরা খুশী হলেই হয়। তাতে দু'পক্ষের ভাগ্যেই ফলশ্রুতিরূপে আনন্দের ভাগ জোটে ; এবং দু'পক্ষই রসিক বলে পরিচিত হন॥

** ** ** ** **

প্রসংগান্তরে এসে প্রথমেই দুঃখ প্রকাশ করছি। ডাঃ মেঘনাদ সাহা ; ডাঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, আচার্য নরেন্দ্র দেব ও শ্রীমবলংকরের বিদেহী আত্মা শান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনাই করি। এঁদের মৃত্যুতে আমরা ব্যথা পেয়েছি—দুঃখ পেয়েছি। এঁরা দীর্ঘজীবী হোন।

ডাঃ মেঘনাদ সাহার মত একজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী ও দরদী কর্মীর মৃত্যুতে দেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল সে কথা তুলে আর বর্তমান আবহাওয়া ভারাক্রান্ত করতে চাই না। তাঁকে আমরা হারিয়েছি, এটা আমাদের প্রাণে বড় হয়ে বাজলেও তিনি যে কর্মপ্রেরণার সমুজ্জল স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাই হবে আমাদের আনন্দ সন্তাপ—আমাদের অবলম্বন।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও পণ্ডিত ডাঃ প্রবোধ বাগচী সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলি॥

আমাদের কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শ্রীহীরেন সেন ও শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত হয়েছি। এঁদের আত্মার সদ্গতি হোক, এই প্রার্থনা করি।

** ** ** ** **

সাহিত্যে এবার 'নোবল' পুরস্কার পেলেন আইসল্যাণ্ডবাসী হালডর কিল্জান ল্যাকস্নেস। কিল্জান ল্যাকস্নেস ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল আইস্ল্যাণ্ডের এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে সংক্ষিপ্ত শিক্ষা শেষ করে ছোট বেলাতেই দুধ বিলি করে বেড়াতে হত তাঁকে। তাঁর প্রথম বই, সতের বছর বয়সে লেখা—"প্রকৃতির শিশু"। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'কাশ্মীরের সেরা তাঁতী' ; 'জনসাধারণের বই' ; 'স্বাধীন মানুষ' ; 'ওলাস কারসেন' ; 'পৃথিবীর আলো' ; 'আইসল্যাণ্ডের ঘড়ি' ও 'পরমাণবিক ষ্টেশন' বিখ্যাত। এগুলি ইতিহাস, লোকগাথা ; স্বদেশের সমসাময়িক সমাজকে আশ্রয় করে লেখা। তিনি চার্লি চাপলিনের সহায়তায় "সাল্কা ভালকা" নামক একটি ছায়াচিত্র পরিচালনা করেন॥

** ** ** ** **

এ বছর নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনের পুরস্কার পেলেন সুকবি শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী। যে বইটির উপর ভিত্তি করে এই পুরস্কার দেওয়া হ'ল তার নাম

'পালা-বদল'। এ সংবাদে আমরা আনন্দিত হয়েছি। পত্রিকার তরফ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

** ** ** ** **

কিছুদিন আগে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর পরিচালনায় দিল্লী কেন্দ্রে একটি কবি-সম্মেলন হয়ে গেল। এই সম্মেলনে স্ব-রচিত কবিতা পাঠ করার জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কবিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। বাংলা থেকে গিয়েছিলেন শ্রীবুদ্ধদেব বসু। তাঁর পঠিত কবিতাগুলির মধ্যে 'সমর্পণ' কবিতাটি স্মরণীয়॥

** ** ** ** **

সম্প্রতি আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, তরুণতম কবি দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলাম্বরী' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে। বইটি ইতিমধ্যেই বাংলার রসিক ও সুধীসমাজে আদর পাওয়ায় আমরাও আনন্দিত হলাম। বন্ধুবর শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর যথেষ্ট ভরসা রেখে আমরা তাঁর উজ্জলতম ভবিষ্যৎ কামনা করি।

** ** ** ** **

আমাদের প্রিয় অধ্যাপক ডাঃ বিজন বিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় এ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি চলে যাওয়াতে আমাদের যে কতখানি ক্ষতি হয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। প্রায় পনের বছর তিনি আশুতোষ কলেজে সুনামের সংগে অধ্যাপনা করেছেন। তবে আমরা স্বার্থপরের মত নিজেদের কথাই ভাববো না; তাঁর জীবনের ক্রম-ভাস্বর অধ্যায় আমরা অবশ্যই মেনে নেব। বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে তাঁর গৌরব বৃদ্ধি হোক— এ-ই আমরা চাই।

** ** ** ** **

অল্প কয়েকদিন হল সুযোগ্য অধ্যাপক ডাঃ মদন মোহন গোস্বামী মহাশয় আশুতোষ কলেজে যোগদান করেছেন। ডাঃ গোস্বামী একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর স্বভাবসুলভ আন্তরিকতা ও রসিক আলাপী মেজাজ দিয়ে তিনি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় করে তুলেছেন। তাঁর মত একজন অধ্যাপককে একান্ত ভাবে পাওয়াতে আমরাও নিঃসন্দেহে সুখী।

** ** ** ** **

আমাদের কলেজের অধ্যাপক শ্রীপরিমল কর তাঁর সমাজসেবার কাজে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি দরদ ও সহানুভূতি সহকারে কাজ করে যে সাফল্য লাভ করেছেন, তা তাঁর জীবনে উন্নতির সোপান হয়ে দেখা দিক, এই প্রার্থনাই করি। আমরা শ্রীকরের অকুণ্ঠ সাধনার পরিপূর্ণতার কথাই ভাবি।

** ** ** ** **

সম্প্রতি সারা ভারতে অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত বুদ্ধ-জয়ন্তী পালন করা হল। বুদ্ধদেবের আড়াই হাজার বছরের স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে পৃথিবীর নানা দেশের অধিবাসীরা যোগদান করেন। বর্তমানে আণবিক বোমায় আতংকিত জগতে বুদ্ধের বাণীই যে একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র অবলম্বন, একথাই লক্ষ কণ্ঠে প্রমাণ করার চেষ্টা হল এই উৎসবে। আমরা 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।

** ** ** ** **

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বভারতীর উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন। অধ্যাপক বসুর এই নিয়োগের কথা শুনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। অধ্যাপক বসু ভারতীয় প্রতিভার এক গৌরবোজ্জ্বল অভিব্যক্তি। এই জ্ঞান-তপস্বীর অনাড়ম্বর জীবন, তাঁর মনীষার অম্লান জ্যোতি, ছাত্রসমাজের প্রতি তার গভীর মমতা ও বাৎসল্য ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব গরিমার আলোক-পাত করেছে। তাঁর পরিচালনায় বিশ্বভারতী ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হবে, —এটাই আমরা কামনা করি।

** ** ** ** **

পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে যাঁদের সহযোগিতা পেলাম তাঁদের কথা দিয়েই এ আলোচনা শেষ করছি। প্রথমেই নাম করবো অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র দে মহাশয়ের। তাঁর কথা লিখতে গিয়ে নতুন করে কি বলবো তাই ভাবছি। এ কয় মাস তিনি যে নিরলস পরিশ্রম করেছেন, যে অমূল্য উপদেশ দান করেছেন, তাতে তাঁকে বাদ দিয়ে পত্রিকার কথা চিন্তা করাও অসম্ভব। তাঁর আন্তরিকতার স্পর্শ সমস্ত পত্রিকাটিতেই ছড়িয়ে রয়েছে, একথা আমি অবশ্যই বলবো।

লিখতে বসে যাঁর কথা বারবার মনে হচ্ছে, তিনি হলেন পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি আযুক্ত অধ্যাপক। তাঁকে ধন্যবাদ জানানো প্রথা নয়; আমার উদ্দেশ্যও বোধহয় তা নয়। তবু একটা কথা না লিখে পারছি না, যে, পত্রিকা সম্পাদনার নানা কাজের ভিতর দিয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে পেরে

আমি নিজেকে অত্যন্ত সুখী বোধ করছি। তাঁর সাহচর্যে নিজেকে প্রস্তুত করার যে সুযোগ পেয়েছি তা আমার পরম সহায় হয়ে থাকবে বলেই আশা করি।

এছাড়া নানা ভাবে যাঁরা আমাদের সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে উপাধ্যক্ষ শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার মহাশয়; অধ্যাপক শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য; অধ্যাপক শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী; অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়; অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক শ্রীগোপিকানাথ রায়চৌধুরীর নাম কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করছি। পত্রিকা প্রকাশের পথে যে স্বাভাবিক বাধার সৃষ্টি হয়েছিল এঁদের সহযোগিতায় তা সহজেই অতিক্রম করতে পেরেছি।

এই প্রসঙ্গে নানা ব্যাপারে যে সব ছাত্রবন্ধু সাহায্য করলেন তাঁদের নাম করি;—শ্রীঅনিলচন্দ্র দাস; শ্রীঅমলকৃষ্ণ সেনগুপ্ত; বিজনকুমার ঘোষ; বাসুদেব গুপ্ত ও শ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। গতবারের সম্পাদক শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ও ব্যক্তিগত ভাবে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলকে আমার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে এবারে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীদিনেশ দাস, শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঔদ্ধসত্ব বসু আমাদের লেখা দিয়েছেন। জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে সু-প্রতিষ্ঠ হয়েও প্রথম যৌবনের সেই মধুর দিনগুলোকে স্মরণ করে তাঁরা যে আমাদের আমন্ত্রণে আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন, এটা তাঁদের মহত্বের পরিচয়ই বলতে হবে। আশুতোষ কলেজের পক্ষ থেকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সংগে এঁদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

**　　**　　**　　**　　**

সব শেষের সংবাদ হ'ল, আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয় শ্রীসোমেশ্বরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এ বছর অবসর গ্রহণ করলেন। চল্লিশ বছর ধরে তিনি আশুতোষ কলেজের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন: মন প্রাণ দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন আশুতোষ কলেজকে। তাই তিনি অবসর গ্রহণ করাতে আমরা ব্যথা পেয়েছি। আমরা তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

**　　**　　**　　**　　**

অবশেষে ছেদ টানার সময় হ'য়ে এল। এবার শেষ করতে হবে। পত্রিকার কথা দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, সে কথাতেই ফিরে বলি,—পত্রিকাটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে যথাসাধ্য সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তবু যদি কিছু দোষ ত্রুটি থেকে যায়

আমাদের সতীর্থ ও শুভানুধ্যায়িগণ নিজগুণে তা ক্ষমা করে নিলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হ'লো, মনে করবো ;—এ কথাটাই বিনীতভাবে সবার সামনে তুলে ধরতে চাই ॥

আমার পূর্ব-সুরীদের উদ্দেশে শ্রদ্ধার প্রণতি ও আমার উত্তর সাধকদের উদ্দেশ্যে অভিনন্দনের বাণী রেখে বিদায় নিচ্ছি। আমার কথা ফুরালো। নমস্কারান্তে।

অসীম সেনগুপ্ত

১

২

৩

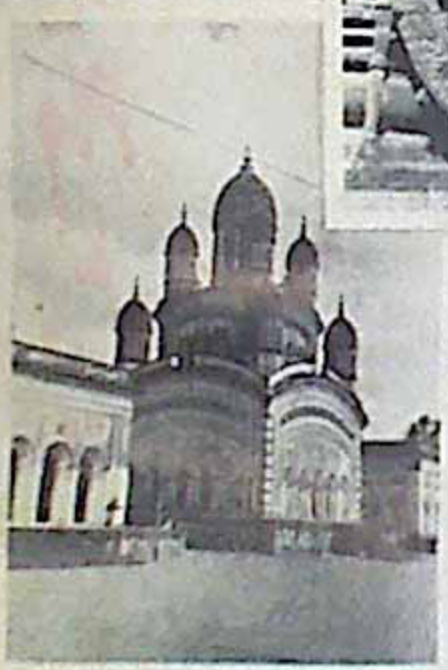

৪

৫

চিত্র পরিচিতি –

১। নালন্দার ধ্বংসাবশেষ—শ্রীসূর্য্যকান্ত দত্ত, প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান

২। সিংহের গম্ভীর মূর্ত্তি—শ্রীগৌতম দত্ত, প্রাক্তন ছাত্র

৩। কোণারকের রথচক্র—শ্রীনিতাই দত্ত, প্রাক্তন ছাত্র

৪। দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির—শ্রীসূর্য্যকান্ত দত্ত, প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান

৫। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল—শ্রীগৌতম দত্ত, প্রাক্তন ছাত্র

CALCUTTA UNIVERSITY BLUES

Top Left : Sri P. Chowdhuri. *Top Right* : Sri Debabrata Chatterjee (Basket ball)
Centre : Sri Asoke Maitra (C. U. Cricket, 1956) *Bottom Left* : Sri
Hockey Team, 1956)

Asutosh College Magazine

1956

Professor-in-charge
Sri JITENDRANATH CHAKRABARTTI

Editor
ASHIM SEN GUPTA

The Study of English in Independent India

NIRMAL KUMAR DE

Third year Arts

When the British rulers of India were thinking of introducing some system of education into this country, the question before them was, whether the medium should be Sanskrit for the Hindus and Persian for the Mohommedans, or English for them all. It was during the administration of Lord William Bentinck that the question was taken up in right earnest; the authorities felt its urgency, and they were determined to arrive at a decision without further delay. Two parties arose, one was for teaching Sanskrit and Persian, the other for teaching English; the former was called the Orientalists, the latter, the Anglicists. There was a good deal of controversy and discussion about it. Raja Rammohan Roy presented a memorial to the Governor-General, proving conclusively the necessity of teaching English literature and English sciences to Indian youths. This added the necessary weight to the side of the Anglicists, and the question was at last decided in their favour. Thus English education was introduced.

Since the advent of independence, the English language has lost much of if its importance. Regional languages are being given preference by the State Governments. Of course, every body will admit that undue emphasis on English is no longer necessary or desirable, and that it is now an imperative necessity to enrich our national language and elevate it to the status of the richest language of the world. All the same, English cannot be altogether eschewed. English happens to be an international language, and to drive it out is to exclude ourselves linguistically from the English-speaking areas as also to be robbed of all the advantages accruing from the lore of English.

In our Constitution the English language has been retained as a State language for a period of fifteen years after which Hindi is to take its place. But even after the fifteen-year time-limit set down in the Constitution, English will continue to demand our attention in view of its being the lingua franca of a very large part of the civilised world.

It is indeed extremely painful to see that those who are now at the helm of affairs in our country, are showing a step-motherly attitude towards the English language. The reaction against English has been responsible for the general decline in our educational standards as it has fostered an unhealthy psychological apathy towards the English language in the minds of the students. Certainly, it would not be unpatriotic on our part if we realise and accept the greatness and richness of a world language like English. We should not overlook the fact that most of our leaders availed themselves of it as a medium of expression in science, literature and politics. Besides every language in India has enriched itself by its association with English. In the sphere of education in our country, English has been of paramount importance. Right from its inception our educational system has accepted English as the medium of instruction. Its abolition would undoubtedly create a vacuum, in view of the fact that no regional language can be properly used as a medium of instruction at the higher stage of education. Every right-thinking man will certainly subscribe to this view-point that the recognition of Hindi as the lingua franca is no bar to acceptance of English as another language for India. We should never ignore the fact that India could not have been what she is to-day were it not for the English language. It is admitted on all hands that the English language has given India her nationalism and contributed to the glorious renaissance in the national language and literature. The study of the English language has deeply influenced our thought, culture, education and mental outlook. To-day we have acquired vast knowledge of science, technology, medicine, modern methods of organisation

and all that, and it is certainly the English language which has enabled us to gain an access to that storehouse of knowledge. English has brought about a cultivation of mind and intellect that is standing us in good stead in our onward march towards peace and progress. It has engrafted into our life a pattern of exactitude and precision that is helping us immensely in discharging various responsibilities of a modern state.

English is one of the principal factors of Indian unity. Although it was the English who enslaved us, it was certainly their language which delivered us from the alien yoke. Great leaders of India, persons of culture and erudition, and persons who enjoyed eminence in the public life of India, spoke very highly of this world language and also used it as a medium of expression in science, literature, philosophy and politics. The Indian National Congress was started by top-ranking English-knowing leaders. Mahatma Gandhi propagated his philosophy of non-violence and Satyagraha through English. Swami Vivekananda would never have been able to proclaim the greatness of the Hindu religion in America but for his knowledge of English. Rabindranath could not have won the Nobel Prize without his knowledge of the English language. Every Indian language has indeed drawn its inspiratiom from the English language. Like a luminous body the English language has shed light and lustre on everything that came under its purview. Today India is distinguished as one of the most progressive nations of the world, and she is also making remarkable progress at rapid strides in every sphere of life. There is no gainsaying the fact that this all-round progress and prosperity of India has been possible mainly through the English language. It would be nothing but a Himalayan blunder on our part to jettison English. Even when English ceases to be a medium of instruction, its knowledge would be regarded as a *sine qua non* in the interest of higher education. Surely this cannot be considered as derogatory to India's nationalism. Even if Hindi is made the medium of

instruction, English cannot be driven out lock, stock and barrel. For it will in that case result in India's reverting to a state of intellectual isolation and stagnation.

The history of India provides us with a lesson as well as a warning in this regard. Even before the dawn of history India used to maintain a living contact with the outside world. In different eras she came into intimate contact with nations like the Persians, the Egyptians, the Greeks, the Chinese, the Arabs, the Central Asians and the peoples of the Mediterranean basin. This association enabled her to achieve two important things. She evolved a dynamic culture and civilisation which was changing and progressing all the time, and which imbibed a wonderful capacity to withstand the shocks of repeated invasions and absorbed and assimilated all the heterogeneous influences and cultures she came across in course of the ages.

Yet, not unoften, the historian comes upon periods when the country appears to have been seized with a mental stupor and lassitude and a physical weariness. While other parts of the world marched ahead, India remained static and immobile. The main reason for this degeneration is, however, not at all difficult to discern. Such stagnation and rigidity synchronised with or followed a stage when India severed all her links with the outside world and retreated into the shell. As a result she fell behind in the march towards progress; she lost her initiative and creative urge. The nemesis was not long in coming in the form of alien servitude.

If we are to avoid a repetition of the same calamity, we must maintain, as our forbears did, a living and intimate contact with the outside world. We must keep abreast of its progress in the realm of art, science, technique and in other allied spheres of human endeavour. For over a century and a half the English language has served as a window to the world beyond India, and it would be the height of folly to suppose that the advent of independence has relieved us of the necessity for continuing the study of that language. On

the contrary, the need for studying English becomes all the more urgent if India is to play the role Providence has ordained for her. Sober people have all along maintained that the English language is the most suitable medium to keep oneself in touch with the outside world. We are sending our students, equipped with knowledge of English, in increasing numbers every year for higher studies abroad. Indeed, we cannot dispense with this language just as we cannot avoid the Gregorian Calendar in reckoning time. India is not in a position to ignore the realities of the situation.

None can, of course, have any quarrel with Hindi being made the medium of instruction. But it should not be lost sight of that Hindi is only a language of Northern India, whereas English is still spoken from Kashmir to Cape Comorin, from Dwarka to Dibrugarh.

In these circumstances it is not possible to push out English without weakening the solidarity of the Indian people. Besides in order that Hindi may be accepted as the universal medium of expression in India it must be made deeper and broader ; its grammar and syntax must be simplified ; its gender inflexions must be rationalised. It must develop a capacity to borrow and assimilate words and expressions from English and the different Indian languages. The Hindi language must be allowed to grow and develop according to the laws of its being into a fit vehicle of expression for modern Indian life. It must grow with the people ; it cannot be imposed upon an unwilling people by governmental fiats. The protagonists of Hindi cannot afford to ignore this elementary human psychology.

Besides with the advent of the age of supersonic speeds distances have shrunk to a mere nothing. A trip round the world in twenty-four hours is a near possibility. Humanity is fast moving forward. The world will not remain static while Hindi is hammered into a proper vehicle for the Indian people. We must keep abreast of this growing world. It can only be done through a world language like English. To

discard this language at this stage would, therefore, be nothing short of self-stultification on the part India.

I would like to quote in this connection what the Daily Telegraph said editorially on Sept. 2, 1948 with respect to India's decision to banish English. "Indian scholars could pass without difficulty from Indian to European Universities. Indian scientists could relate their researches to the most advanced achievements in the same field. A far from negligible indigenous literature was produced. Even writers like Tagore who prided themselves on their orientation were deeply influenced by western trends. As English passes out of current usage and is studied as a foreign language, the merging of European and Indian authors must diminish." This will signify a great danger for India.

The pronouncements of some of the distinguished educationists and public men in this connection lean heavily on the side of indispensibility of retaining English as a very important language in India. They do not appear to have even set down a dead-line for it, nor even stated it to be necessary for "sometime". The Indian philologist, Dr. Suniti Kumar Chatterji, while replying to a reception accorded by the West Bengal Congress Committee in Calcutta on Aug. 21, 1955, said, "Any modern Indian language should rest on two wings, Sanskrit and English. To neglect Sanskrit would be neglecting the rich heritage of the past, and similarly to neglect English would mean shutting our eyes to developments of the present and jeopardise the future. English is the essential link to India for maintaining contact with the outside world." (Amrita Bazar Patrika, Aug. 22, 1955.)

In his convocation address to the Utkal University Dr. H. C. Mukherji, Governor of West Bengal, said, "The English language is one of the most valuable legacies that they (the British) have left behind for us. I venture to think that an ability to handle English should be a *sine qua non* for a University man who will have to represent his

country's intellectual advance before the comity of nations." (Amrita Bazar Patrika 28-11-'52).

Dr. Bhagwan Das, while delivering his convocation address to Banaras University, observed, "We have to regard English as important for us ..... Our political, diplomatic and ambassadorial relations with other countries, our exchange of goodwill missions and professors and students, our exports and imports—all these entirely depend on English as our only means of communication and correspondence with other countries." (Amrita Bazar Patrika, 26th December, '52).

Addressing the convocation of the Punjab University Dr. Kailash Nath Katju said, "While the anxiety to have smaller units will undoubtedly help to develop regional languages the disappearance of the English language from India will deprive the country of a vital thread linking together the various units of the Union. No replacement of that thread is easy to find out." (Amrita Bazar Patrika, 14-12-'52).

In his recent speech in the Rajya Sahha, our Prime Minister said, "If this country grows up and forgets foreign languages, notably English, no matter how cultured we are in Hindi, Bengali, Tamil or Telegu, I have no doubt we will become second-rate." (Amrita Bazar Patrika, Jan. 3, 1956).

At Hyderabad on 8th December, '55, Sri Nehru said, "It would have been better if the English language had been included in the list of languages recongnised in the Indian Constitution, not only because of its intrinsic worth and current value and the number of people who use it, but also because it was the mother tongue of the Anglo-Indians, who are Indian Nationals." (Amrita Bazar Patrika, Dec. 30, '55). Sri Nehru's observation can, of course, be easily implemented by including English in the Constitution by an appropriate amendment.

Mr. C. Rajagopalachari, in course of his rectorial address at the Madura College, said, "India should retain the English

language which is a gift by our Goddess Saraswati." (Hindusthan Standard, March, 7, '53).

Recently, Mr. Rajagopalachari, while giving his views before the Official Language Commission on the questionnaire issued by the Commission, said, "Throughout India now, all people, who have received education to fit themselves for work in public offices, speak and write English decently. English is the one language that is written and spoken universally among the educated classes all over India without distinction of Province or area. Why should we give it up? One should not cut off one's nose to spite one's face. Acquisition of a language is not easy, and we should not foolishly surrender what we have got."

"English is not a mark of disgrace. It has not so operated in the international world so far. We have not lost either self-respect or prestige among others in the international world because we have been freely and without any hesitation using English for more than a century and a half, and we have acquired in the counsels of the world as much power as we have acquired only through the language medium."

"We should not begin a revolution at the wrong end and cause or suffer hardship and inefficiency all round for bringing about a national improvement. It is, I say, to begin at the wrong end to impose Hindi before we have attained, all of us, as much proficiency in that language as we possess now in English." (Amrita Bazar Patrika, Jan. 11, 1956.)

Sri K. M. Munshi, Governor of Uttar Pradesh himself a noted scholar and writer in Guzrati, in his Kulapati's Letters, published in the Amrita Bazar Patrika of 27th July, 1951, wrote, "It is saddening, the way our Government and Universities are racing with each other to give up English. They fail to realise that our unity and progress are both bound up with English for a long time to come; because of this failure, educational standards are being lowered all over the country."

"This attitude is an inferiority complex, in part, it is

a carry-over of the 'Quit India' psychology. Though free, we have not yet attained the outlook of the free. We can not distinguish between our dislike of foreign rule, which no longer exists and our need of English, which is no longer foreign but an Indian language."

Dr. C. V. Raman said that it would be disastrous for India if the study of an international language like English was relegated to the background.

Dr. Radhakrishnan has strongly asked for its retention as a medium of instruction in higher education.

All these pronouncements, coming as they do from some of the most distinguished men of India, must, indeed, count in deciding the future of India.

In conclusion, I would like to state that it would, indeed be an evil day for India if in the battle of languages that is raging in India passions and prejudices are permitted to relegate to the background one of the finest, sweetest and richest languages of the world—a language with a most glorious literature. English must be given its due place in modern India.

Should Capital Punishment be Abolished

AMAL KUMAR DE

Second Year Arts

The approach to the question of the abolition of capital punishment hinges largely on the psychological outlook and the attitude towards death, its severity and horror, conditioned by the moral, ethical and religious beliefs of a people. This outlook varies, and some are terrified at the thought of condemning one to death, while some take it as an ordinary and an inevitable punishment for an outrageous crime.

Capital punishment, according to one school of thought, is necessary to maintain law and order. Ten or fifteen years of imprisonment, according to the advocates of capital punishment, is not a sufficient punishment for persons committing murder for sordid motives and mean objectives. Long periods of imprisonment mean waste of public money. Moreover, the fear of being awarded the death penalty has had, they opine, a restraining effect on the bad elements in the country, and, therefore, capital punishment should stay.

But, viewed in the perspective of the modern approach to crime, the above-mentioned views of the supporters of capital punishment do, we find, betray a complete lack of understanding. A criminal is not the product of a day or two. Behind him lies a long array of conflicting situations, painful frustrations and the like, which may be traced right back to his childhood days. All these factors drive him to a corner where he tries to break loose by attacking the person whom he suspects to be the main reason for all his troubles.

Therefore, if we look into a crime more considerately, it becomes clear that a criminal is a normal person, but with

serious emotional problems unresolved. In many cases, if we show enough patience and tolerance, we can surely save a life. Instead of this we rashly condemn the murderer to death. To the criminal, sentenced to death, capital punishment is nothing but a forced ending of his life. It seems reasonable, therefore, to ask for the abolition of this extreme penalty, and to send the murderer to jail for a long term, where he can be put to some use to society and also be reformed. We are not sure that the imposition of capital punishment has kept down homicidal crimes to a minimum. For a habitual criminal or a normal man, who loses his sense of reasoning in a sudden fit of anger, never thinks of the gallows at the moment of committing a murder. He is only concerned with the immediate results. And there are also various other reasons underlying such acts for which we have to look elsewhere for a remedy.

Death penalty, which can be termed as "judicial murder," is considered to be a relic of a barbarous age, and is based on the primitive maxim of "a tooth for a tooth, and an eye for an eye." Capital punishment has been abolished in many countries. Recently, Great Britain has abolished it. Life for a life cannot serve the purpose for which punishment is imposed. A man must repent of the wrong he has committed; he should atone for his sin; he should attempt to turn over a new leaf. Punishment reminds him that he has done a wrong, and he should not repeat it. But the whole objective becomes frustrated if the life of the man, committing the crime, is taken away. The opportunity for reforming himself is thus denied. Of course it may be said that under the prevailing system our prisons turn men into hardened criminals. The need for reforming the jails cannot be over-emphasised. In spite of that, the majority of the people all over the globe have felt that the law for capital punishment should be removed from the statute-books. Great Britain must be congratulated on their recent decisions. Incidentally, it may be mentioned that the party which controls the reins of administration in India, is wedded to the Gandhian

principle of non-voilence. The moral code of this cult requires immediate stoppage of capital punishment in this country. Sometime ago the question came before the legislature. Time has now come when our rulers should come to a decision about this vital question. The plea that abolition of capital punishment will encourage criminals to commit heinous crimes, does not, it goes without saying, hold good in this scientific age. Principles of morality and jurisprudence demand that steps should be taken to raise the level of human conduct. Capital punishment cannot serve this purpose. It only increases the rebellious nature of the offender. We are all mortal. Sooner or later we must die. Hence, there appears to be no justification for sentencing a criminal to death. He will die at his appointed hour. We need not get rid of him hurriedly. In fact, we should try to bring home to him how he can become a good citizen. The psychological effect of his release will go a long way towards making him realise the folly of committing crimes. Moreover, we should have full faith in humanity because in this way God forgives our sins. He rejoices when people believe that man is His image and semblance, and grieves if man, forgetful of human dignity, regards his fellow men as worse than dogs. The sentence of acquittal may bring harm to the inhabitants of a town but the beneficial influence of that faith in man will be immense—faith which does not remain dead; it rouses generous feelings in us, and impels us to love and respect every person. Capital punishment is repugnant to human dignity, and we have seen that fear has never been a deterrent factor in the case of criminals. We have never been, and shall never be, able to frighten a rogue into honesty. On a strictly objective observation, it, therefore, seems that the whole machinery of the state pounces upon a criminal as if to satisfy its spirit of revenge for the disturbance of peace.

It is time we changed our attitude towards criminals. Society should treat them more as patients than as undersirable elements. It should first of all probe deeply

into the various causes of these crimes, and then find out ways and means to eliminate them. Simultaneously, it should undertake the task of reforming the minds of criminals and help them to become useful members of society. An attempt to check crime by killing criminals is entirely a negative approach.

In conclusion, it may, therefore, be stated that sending the accused to the gallows is not at all defensible. Society has, of course, to rid itself of all the evils which lead to crime. But after all, all crime is pathological, and so it should be our duty to save the life of a criminal instead of putting him to death. The abolition of capital punishment will help us to adopt a constructive attitude towards the problem of crime and criminals. The findings and views of many committees also lend support to the case for abolition.

I feel, therefore, that capital punishment should be abolished as it is certain that whatever be the cause behind the murder, there is every possibility of the murderer turning a new leaf when he is made to understand the loathsomeness of the act.

What a piece of work is a man! How noble in reason! how infinite in faculty! in form, in moving, how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a god! the beauty of the world! the paragon of animals!

—SHAKESPEARE

The Activities of The Youth Camp at Bawali

PROF. PARIMAL KAR, M.A.

1. Asutosh College, Calcutta, organised a Youth Welfare and Social Service Camp at Bawali in the District of 24—Parganas. It was sponsored by the University of Calcutta and financed by the Ministry of Education, Government of India.

2. Like many Indian villages, Bawali is deprived of medical attention and proper educational facilities; it is left without guidance in agricultural matters; it lived till 1947 under a type of feudalism which may well be termed mediaeval. The people live in unhygienic surroundings. They take water from tanks already polluted by washing and bathing and, consequently, suffer from various intestinal afflictions including cholera for the major portion of the year. There are persons (whose number is not negligible) who cannot afford to have two meals a day. No wonder, therefore, that a sizable section of the population appears disinterested, without ambition or vitality. Raw materials, which could provide employment and bring cheer and health to many homes, are wasted. This hopeless situation can be tackled by the step-by-step development of a complete programme of rural reconstruction.

3. The limited time at our disposal and the lack of experience of the campers in rural work (some of whom) had never before lived in villages) stood in the way of our undertaking very ambitious programmes of work. It is our experience, however, that in spite of short-comings due to limitations of time, finance and trained personnel, such camps have a great educational value both for the local community and for students themselves. The former gets impetus from

WINNER OF INTER-COLLEGIATE

PAIR—OIRS, 1956

Sitting from Left : (Stroke) Ashok Chatterjee, Prof-in-charge of Games—Sree Biswanath Mukherjee. Principal Sree Someswar Mookerjee. Vice-Principal Ramen Sarkar. (Bow) Rama Prasad Chatterjee (Captain). Provat Ghosh (Games Secretary).

ASUTOSH COLLEGE CRICKET TEAM, 1955-56

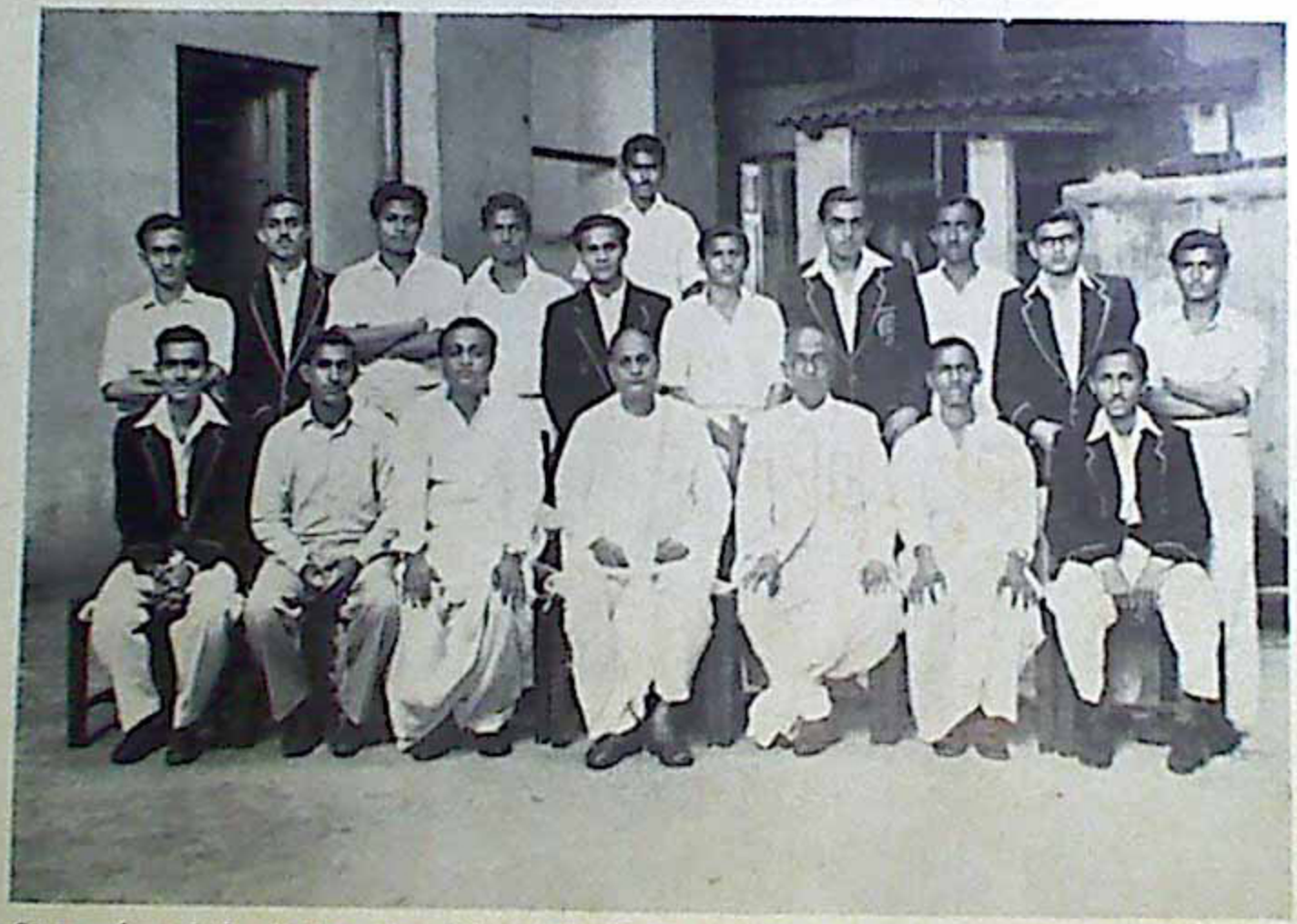

Sitting from Left : S. Banarjee (Captain), G. Chakraborty, Biswanath Chakraborty, (Prof.-in-charge of Games) Principal Someswar Prosad Mukherjee, Vice-Principal Ramen Sarkar, Prabhat Kumar Ghosh (Games Secretary), D. Bose (Vice-Capt).

Standing from Left : P. Roychowdhury, C. Banarjee, P. Sen, S. Mitter, S. Roy, M. Roy, V. N. Chaturvedi, D. Roy, A. Moitra, G. Gupta.

Standing Back : College Mali.

the activities of the camp, while the latter realise for the first time the wide gap that exists the living conditions of the village and the town.

4. The first week was devoted almost entirely to fact-finding and arranging the needs of the village in order of priority. From the second week onwards our main endeavour was to place the facts before the local people and to make them conscious and generate their enthusiasm to get things done. We tried to impress upon them that the task of community improvement is ultimately their own responsibility, and that they should not look helplessly towards Government or any outside agency for any help, monetary or otherwise. We, therefore, took particular care not to undertake any work programme without the co-operation of the villagers in the form of labour and materials. Even our programmes were drawn up in consultation with the Village Development Council. As a matter of fact, we guided the discussion of the Council until we succeeded in generating action on the part of members. Thus the schemes were prepared according to the needs of the people by the people themselves. The villagers' co-operation was, therefore, readily available in the fullest measure in all our activities.

5. The above approach explains the logic of the measures undertaken by us in this 21-day camp. We have done all that was considered necessary to inspire the local people with a spirit of self-help and to equip the village workers with knowledge, both theoretical and practical, to engage in social work. The immediate results achieved through this method may not be spectacular, but they will be enduring and highly effective in the long run. The people are further strengthened by this process.

6. I am glad to record here that we have found out some active workers among the non-student youth of the village. I feel confident they will be able to bring about a silent revolution in the minds of the people, and find the means by which to bring these people into the programme

to sustain their interest and to keep it moving forward. What they need, however, is encouragement, guidance and some help from outside.

7. What we have achieved in this Camp has only laid the foundation stones for more ambitious schemes of rural reconstruction, covering all aspects of village life. If the work is followed up, we can turn from activities that has been predominantly exploratory to a long-range programme of village improvement. Experiments would still be required before new features could be incorporated, and the methods in use must constantly be improved. But the steps for attaining the final goal are now fairly clear. A co-ordinated plan of action based on a definite pattern can henceforth be followed.

8. The first step towards reconstruction of the village should be the provision of drinking water. Part IV clearly brings out the appalling scarcity of drinking water in these areas. If we can successfully tackle this problem, we shall at once win the confidence of the people and then we can move on from things economic to problems of a more general nature. If our efforts are sustained continuously for a period of two or three years, we may be able to achieve the ideal of Co-operative Village Management, as visualised by the Planning Commission, in no distant future. The villagers are willing to contribute voluntary labour towards meeting a part of the total cost of installation of tube-wells.

9. There are various problems in the village (such as provision of tube-wells, construction of a sluice gate, etc.) which cannot be solved on the basis of self-help alone. Outside help in the form of materials and technical know-how are indispensable in the initial stages.

10. Our success at Bawali will serve as candles to the people of adjoining villages lighting their way out of darkness in which they find themselves at present. Our experiment acquires meaning and importance in this context.

The Report of the Students' Union

The New Secretary takes over :

The Students' Union for the year 1955—56 was formed in the month of Dec., 1955 and the charge was made over to me on 5th January, 1956.

Netaji Birthday :

On the 23rd January we celebrated the Birthday of Netaji Subhas Chandra Bose in collaboration with the Unions of the morning and evening departments. Principal Someswar Prosad Mukherjee hoisted the National Flag. The programme also included recitations and patriotic songs.

The Republic Day :

This is for the first time that the Students' Unions of the three departments observed the Republic Day on the 26th January in the College Hall. The programme of the day was simple but impressive.

Saraswati Puja :

The Saraswati Puja constitutes the greatest cultural function organised by the Students' Union. This year the ceremony, which came off on the 16th February, was performed with great pomp and pageantry, jointly by the Students' Unions of the three departments. This year's celebrations, however, were marked by certain special features. Amplifiers and mikes were omitted. Special arrangements were made for the proper distribution of the "Prosad" and for performing the immersion ceremony.

The College Poor Fund :

For the first time in the history of the Ashutosh College Students' Union we undertook the responsibility of raising money by a coupon system—for the purpose of rendering pecuniary assistance to those candidates sitting for the

University examinations, who are unable to pay their examination fees. We shall also arrange a film show immediately after the vacation in aid of our College Poor Fund.

College Sports and Games :

Our College Annual Sports were held on the 30th and 31st January in our College Ground under the Presidentship of Mr. Justice Rama Prosad Mookerjee. We are glad to announce that we have become the proud winners of Inter-Collegiate Knock-out Regatta and Inter-Collegiate pair oars regatta. In the Inter-Collegiate Football league we have become the Group Champions and in the Inter-Collegiate knock-out football, we annexed the Runners-up Trophy. We have also become the Runners-up in the Inter-Collegiate Cricket League. In this connection, we may also mention that we have become the winners of "Chandi Charan Shield" from Bankura.

College Spring Social :

This year, the Spring Social was held in the College Hall on 10th March, 1956. Principal Someswar Prosad Mukherjee presided over the function. There were both vocal and instrumental music programmes, and the play "Griha-Probesh" was successfully staged. Our Hall was beautifully decorated and the function was a great success. The members of the Gymnasium also displayed wonderful physical feats. In this connection we offer our sincerest thanks to Prof. Sunil Kumar Siddhanta and Prof. Parimal Kar for the valuable suggestions and encouragement that we received from them.

Inter-Collegiate Body-Building and Weight-lifting Championship :

We are glad to announce that this year also we secured the first place in all the items of the Inter-Collegiate Body-building and Weight-lifting Competitions, and secured the coveted Trophy for the College. We thank Sri Provat Kumar Dutta, Sri Amal Sen, Sri Monojit Bose, Sri Bijan Banerjea, Sri Sunil Das and Sri Amal Nag for their glorious achievement.

Cheap Canteen and its extension :

We are glad to announce that, we have succeeded securing more space for our Cheap Canteen. This has removed a long-felt want. We are extremely grateful to our Principal without whose help this would not have been possible.

The Union Room :

The Students would be glad to know that we are having discussions with the other two Students' Unions regarding the Students' Union Room. We are trying our best to ensure a better arrangement of things. We hope that we will be able to do it very soon, and it will be possible for us to supply to poor students paper, exercise-books, laboratory note-books, pencils and other necessary things at a cheap price.

The College Tent :

We have the pleasure to announce that our College Tent is almost complete. We hope to open it very soon. We thank the College authorities for their prompt action in this affair. In this connection we would like to bring to their kind notice that if a tube-well is sunk in the compound of the tent, it will remove an outstanding want.

Prof. H. N. Sen :

The sudden death of Prof. H. N. Sen came as a rude shock to us. As a Professor of Chemistry he served this institution for long years. He was an erudite scholar inside the class room and a kind, humane and generous soul outside it.

Prof. M. Saha :

With the death of Prof. M. Saha India has lost one of the Greatest Scientists and Humanitarian Leaders. We also mourn his loss.

Conclusion :

Last of all, we sincerly thank Prof. Kantish Chandra Maity, the President of our Union, for the kind help he has given and the enthusiasm that he has shown in all affairs.

PROVAT KUMAR DUTT,
General Secretary.

The Report of Sports and Games

It is about a year since the charge of sports and games was entrusted to me. At first I was afraid lest I should fail to perform my duties as ably as my predecessor. It is a pleasure for me to remember the wholehearted co-operation I have received from my colleagues in particular and my brother students in general. The Prof.-in-charge of games, Sri Biswanath Chakraborty, has rendered invaluable help to us in conducting the inter-collegiate and inter-sectional sports and games. Last but not least is the patronage we have received from our Principal, Sri Someswar Prasad Mukherjee. As a never-failing friend of the students Principal Mukherjee came forward with his wise counsel and active encouragement in times of troubles.

The remarkable success we have achieved and the reputation we have earned this year, and did in the past, is all due to the continuous efforts of the players who participated in the different games. A subustantial share of the credit also goes to the large number of students and the members of the teaching staff who encouraged our players by their presence during the game.

Annual Athletic Sports :

The annual sports of our College were held on 30th and 31st January, 1956 on our own College ground. It was a gala performance and a grand success. It was celebrated with befitting solemnity, pomp and grandeur. The keen contest among the competitors and the lively interest taken by both the teachers and the students, made the occassion a gala day of all-round success. Before the commencement of the function, our Principal hoisted the College flag. The Hon'ble Justice Rama Prosad Mookerjee kindly presided over the function and gave away the prizes and certificates of honours to the winners.

The individual championship was won by Sri Sukumar Sarkar. The members of the N.C.C. of our College maintainted discipline in the field with admirable patience. At the end

of the events the President delivered a brief but neat speech. We declare with great joy and pride that we have seen a high standard of athletics in the different events this year. This shows the inprovement of our students in the sphere of athletics. Last of all, we acknowledge our gratitude to the Calcutta University Sports Board and its Jt. Secretary and Bangabasi College, who helped us in various ways to make it a success.

Basketball : In the Basketball tournament the results have not been up to our expectation. It is a misfortune that our team was defeated by Charu Chandra College in a very gruelling semi-final match in the Inter-Collegiate Basketball Competition.

Football : Our achievement in football is very glorious. Though we were a most formidable side, we have not done up to our expectation. For the first time we won the Nanda Memorial Challenge Shield of Bankura, one of the best coveted trophies of West Bengal. We were the runners-up in the Elliot Shield.

Athletics : In the inter-collegiate athletic championship, we did nothing worth mentioning. A team of twelve athletes represented our College.

Cricket : The Cricket team added another glorious chapter to the history of our College Sports and games, though we had to do without the services of great players like R. Guha, G. Chakraborty, A. Sen and K. Bhattacharya in the same year. We were the Runners-up in the Inter-Collegiate League Cricket.

Volleyball : This year we went up to the final of the Inter-Collegiate knock-out tournament run by Volleyball Federation and became the joint champion with City College.

Hockey : This year we have highly improved upon our hockey standard of the previous year. In the Inter-Collegiate League our position was second in Group I. In the knock-out tournament we went up to the semi-final. Unfortunately, we lost to St. X'avier's College.

Rowing : In rowing also we maintained our high reputation. Ramaprosad Chatterjee of our College was included in the C. U. Rowing Team which took part in the regatta with the Rangoon University Rowing Team.

University Blues : It gives me much pleasure to announce that five of our College boys got the University blue for the current year. They are (i) Asoke Moitra (Cricket), (ii) Pijush Roychowdhury (Football), (iii) Ranjit Banarjee (Foootball), (iv) Debu Chattarjee (Basketball), (v) S. Roychowdhury (Basketball).

Our felicitations : It was through the kind efforts of the authorities of our College that we were able to secure a play-ground some time ago. Since then we have been badly in need of a tent. Fortunately, this year, our much-coveted tent has been built in the Calcutta maidan. I promise that this tent will be one of the finest in Calcutta, and will provide all modern amenities. This tent will be ceremonially opened as soon as the structural work is finished. On behalf of the games section, I express my deep feelings of gratitdue to the Governing Body, specially, to our President, and Principal S. P. Mookerjee. It is mainly because of them that our long-felt desires have been fulfilled.

Last of all, I look forward to the day when our College will win fresh laurels in the field of sports and games.

PRABHAT KUMAR GHOSE,
Games Secretary.

> The world as a whole would do well to recognise Nehru's wisdom..... If we are to be saved from nuclear destruction it will only be through acceptance of the precepts he has preached to the East and the West alike.
>
> *Tribune, London, Dec. 30, 1955*

Editorial Notes

I feel a genuine sense of pleasure to be able to place this thirty-first issue of our College Magazine before our fellow students, friends, patrons and well-wishers. In selecting the pieces we have spared no pains to see that the glorious tradition of our College Magazine is properly maintained. We shall consider our labours amply repaid if the present volume commends itself to our readers, and they find something worth reading in it. The Magazine echoes the thoughts, sentiments, dreams and fancies of thousands of students belonging to this College. It embodies the spiritual ideals that the College stands for.

When I scribble these notes my thoughts naturally turn to this great Institution which steps into the forty-Second year of its existence to-day. The story of its humble beginning and its phenomenal growth and development reads like romance. The imposing building of our College constitutes an important landmark of this part of the city. It whispers the enchantment of the glorious days when the great Sir Asutosh Mookerjee laid the foundation of the College, and when his illustrious son, Dr. Syama Prasad Mookerjee, built this magnificent structure. This College is really the precious life-blood of these two master spirits embalmed and treasured up for a purpose beyond life.

** ** ** ** **

It was with feelings of deep sorrow and grief that we received the sad news of the death of Prof. Hirendra Nath Sen of the Chemistry Department of our College. His popularity as a teacher, his genial temperament, his capacity for hard labour, and his devotion to duty endeared him to his students and colleagues. His death is a distinct loss to our College.

The death of Dr. Ajit Kumar Mukherjee at a rather tender age is a tragedy of unutterable poignancy. He was a brilliant student of our University and possessed a charming personality. He was for some time a member of the staff of Asutosh College.

We offer our sincere condolence to the members of their bereaved families.

** ** ** ** **

In the death of Dr. Meghnad Saha India loses one of the greatest scientists of our times. He belongs to that gallaxy of brilliant scientists whose contributions have ushered in a renaissance in the field of science in India. Dr. Saha has discovered the great law of Thermal Ionisation. It is acclaimed as one of the ten great fundamental laws of science. In recognition of his great contributions to science he was made a Fellow of the Royal Society. He took a leading part in introducing the study of nuclear physics into this country. He was the moving spirit behind the Indian Association for the Cultivation of Science at Jadavpur. In collaboration with other scientists and astronomers he compiled an Indian Calendar. Towards the end of his career he took to politics. His heart bled at the sight of the abject misery and destitution of the uprooted humanity from East Bengal. Our countrymen will long cherish the memory of this great son of Bengal.

** ** ** ** **

The retirement of Principal Someswar prasad Mookerjee from Asutosh College brings to a close a glorious chapter in the history of this great Institution. He was associated with this College from its very inception. For forty long years he had served this college with remarkable zeal, energy and devotion. He was Principal of the Day Department for the last eight years. He was one among the few distinguished Principals of Calcutta in recent times. He was the first Prin-

cipal of Asutosh College to be elected a member of the Senate, the Academic Council, and the Syndicate of the Calcutta University. He was held in great love and esteem by his students and colleagues. In times of crisis he stood by them and proved to be a never-failing friend, philosopher and guide to them. He was, however, a strict disciplinarian; the erring students were overawed by his presence. By virtue of his wonderful tact, his cool courage, his vast experience in college administration, and above all by the magic of his personality he conducted the affairs of the College with conspicuous ability. During his tenure of office the College went from strength to strength. He took a keen personal interest in the College Magazine. As a matter of fact he has left the deep impress of his great personality upon every aspect of this College. His retirement creates a great void in our life, he was so much a part of this Institution. We pay our respectful homage to Principal Mukherjee. May God bless him with long years of peace, health and happiness.

With the retirement of Principal Mohini Mohan Mukherjee of the Morning Department we miss another colourful personality. He was a popular professor of English and a brilliant talker. He was the first editor of our College Magazine. For many years he was the soul of the Magazine of the Morning Department. We pay our respects to him.

Though inexorable time forces us to part company with these venerable teachers, yet we hope their wisdom and experience will light our path in our future journey.

** ** ** ** **

On May 25, 1956—the full-moon day in the month of Baisakh this year—India celebrated the 2500th anniversary of the Mahaparinirvana of Lord Buddha. He is the greatest figure of Indian history. He is one of the foremost moral and religious teachers of humanity. He brought about a moral and spiritual upheaval in Asia. His birth, his great renunciation, his enlightenment, his noble sermons, his Mahaparinirvana

—all these constitute a magnificent epic. They are full of deep spiritual significance to mankind. It was his teachings that inspired Emperor Asoka to send missions of peace and love to Ceylon, Tibet, Burma, Thailand, Cambodia, Indo-China Java, China, and Japan. Two thousand years ago these great countries were knit together by ties of mutual love, respect and friendship. They formed something like a spiritual federation. But the world today presents a picture of gloom and despair. Humanity totters on the brink of annihilation. In the midst of this encircling gloom Lord Buddha's doctrine shines like a taper of blessed hope. If man is to survive, he must evolve a new ethical code; he must develop a new philosophy of life. Panchashila as enunciated by Prime Minister Nehru constitutes the essence of Buddha's moral doctrine. It points to the path of life. It has considerably eased the world tension. It is heartening to find that many countries of the world have already subscribed to these noble principles. Considering the inevitable extinction staring mankind in the face, let them find their ultimate stay in Lord Buddha's sublime doctrine of love and *ahimsa*.

** ** ** ** **

Dr. Bijon Behari Bhattacharya was for many years the Professor-in-charge of our College Magazine. He has since joined the Calcutta University as a full-time lecturer in Bengali. Dr. Bhattacharya is a dynamo of human energy. I wonder how in the midst of his multifarious activities he could make time to work for the Magazine. The magic touch of his genius transformed our College Magazine into a thing of beauty. We are sorry to miss his pleasant company. But we are confident that in times of need we shall not be deprived of the benefit of his valuable advice.

** ** ** ** **

We are deeply indebted to Sri Premendra Mitra, Sri Dinesh Das, Sri Biram Mukherjea and Sri Suddhasattwa Basu. These

distinguished men of letters are all ex-students of our College. At our request they have very kindly sent in their contributions for our College Magazine. It gladdens our heart to find that they still cherish with affection the sweet memories of their college days ; they graciously acknowledge the mystic tie of affinity that binds them to mere boys like us.

** ** ** **

In bringing out this issue of our College Magazine we have received every form of help and guidance from many of our respected professors. Vice-Principal Ramendra Krishna Sarkar and Prof. Nirod Kumar Bhattacharya have retained a soft corner in their hearts for our Magazine. In spite of his terrible preoccupations Prof. Jitendra Nath Chakrabartti, our Professor-in-charge, has devoted a good deal of time and labour on it. Prof. Suresh Chandra De has taken a keen personal interest in our Magazine. He has been closely associated with the different stages of its publication. Prof. Biswanath Bhattacharya, Prof. Parimal Kar, Prof. Kantish Maity, and Prof. Gopikanath Roy Chowdhury have also helped us in various ways. We respectfully acknowledge our debt of gratitude to all of them.

Among our fellow students who have rendered a great service to our Magazine, the names of Sri Bhupesh chatterjee Sri Amal Krishna Sen Gupta, Sri Samarendra Sen Gupta, Sri Anil Chandra Dass, Sri Surjya Kanta Dutta, Sri Umesh Chandra Guptā, Sri Krishna Kumar Chaturvedi, Sri Prabhat Dutta and other friends of the College Union, come uppermost in my mind. We offer our hearty thanks to these friends.

In this connection we record our warm appreciation of the services of Sri Biram Mukherjea of the Navana Printing Works. Being an ex-student of our College he has seen the Magazine through the Press with fraternal care and solicitude. We owe him a deep debt of obligation.

Apologia.

It is a matter of regret that it has not been possible for us to publish this issue of the College Magazine in due time. The delay was all due to circumstances over which we had no control. We beg to be excused for the trouble and worry that have been caused to our fellow students and contributors.

ASHIM SEN GUPTA,
Editor.

2nd BENGAL BN. N. C. C.

'B' COY (ASUTOSH COLLEGE)

Annual Training Camp. Ch'ttaranjan, 1955

Sitting on Ground (Left to Right)—L/Sgt. T. Kanthal, Cdt. R. Mondal, Cdt. A. Ghose, Cdt. A. Dey, L/Cpt. A. Goswami, Cdt. B. Nandi, Cdt. R. Mookherjee Cdt. S. Sen, L/Sgt. K. Sen.

Sitting on Chairs (Left to Right)—R.Q.M.S.—B.Ghose, Hav. K. Bhatia, Lt. P.Chatterjee, Major R.K.Yadav (C.O. 2nd Bengal BN. NCC), Principal S.P.Mookherjee Capt. J. M. Kar (O C 'B' Coy), Sub. S. P. Sukla, 2/Lt K. S. Chatterjee, U/O. M. S. Bannerjee, Naik Sheer Singh, C.Q.M.S. T. K. Das.

Standing 1st. Row—Cdt. G. Saha, Cdt. P. Chakravorty, Cdt. S. Roy, Cdt. B. Roy, Cdt. N. Deb, Cdt. M. Gupta, Cdt. N. Ghose, Cdt. S. Chakraborty, Cdt. K. Mokherjee, Cdt. B. Dey, Cdt. P. Sen Gupta, Cdt. P. Sen, Cdt. D. Dey, Cdt. M. Nath, Cdt. S. Tagore, Cdt. A. Pakrashi.

2nd. Row—Cdt. S. Nandi, Cdt. D. Mazumder, Cdt. K. Bannerjee, Cdt. H. Saha, Cdt. M. Saha, Cdt. P. Bhattacharjee, Cdt. P. Bose, Cdt. S. Bannerjee, Cdt. P. Bose Roychowdhury, Cdt. R. Biswas, Cdt. S. Ghose, Cdt. Cdt. U. S. Ambali, Cdt. K. Panchal, Cdt. P. Bannerjee, Cdt. J. Roy.

3rd. Row—Cdt. K. Ghose, Cdt. D. Roy, Cdt. D. Talukder, Cdt. A. Mookherjee, Cdt. D. Chakraborty, Cdt. J. Mukherjee, Cdt. I. Sen, Cdt. Cdt. S. Bannerjee, Cdt. A. Bannerjee, Cdt. A. Goswami, Cdt. B. Chakraborty, Cdt. M. Mookherjee, Cdt. S. Bhattacharjee.